আইনষ্টাইন

জীবনী
বিজ্ঞান
আদর্শবাদ

ভূমিকা

শুধু বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের জীবনের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বইখানা রচিত হয় নাই। শুধু বৈজ্ঞানিক বললে তাঁর একটা সীমায়িত পরিচয় দেওয়া হবে মাত্র। একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী বা চিন্তাবীর বা আদর্শবাদীও তিনি শুধু নন। তাঁকে বলা যেতে পারে যুগ মানব। তাঁর বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার পথে প্রবর্তন হয়েছে নূতন যুগের, প্রকাশ হয়েছে নূতন বিশ্বরূপের। নূতন আদর্শ বা নূতন চিন্তাধারা গড়ে ওঠে যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে, আইনষ্টাইন তাঁর বিজ্ঞানের সাহায্যে সে ভিত্তিকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে রচনা করেছেন। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে এবং উঠছে এই যুগের দর্শন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, শিল্প, সাহিত্য ও ব্যবহারিক জীবন।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কোপারনিকাস্, গ্যালেলিও, নিউটন এবং নিউটনের সমসাময়িক ভাবে ডারুয়িন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপরে গড়ে উঠেছিল অতীতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের আদর্শবাদ, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন।

নিউটনের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত আমরা জগৎকে জেনে এসেছিলাম একটা বিরাট যন্ত্র-স্বরূপ হিসাবে। সব কিছুই কলের মত স্থির নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়মে চলেছে; প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যাপক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নীহারিকা, গ্রহ-তারকা ইত্যাদির পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপার থেকে পৃথিবীর পথের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও যান্ত্রিক নিয়মের অনুগামী, এই বৈজ্ঞানিক মতই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এতদিন।

নিউটন ধারণা করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে কোন একটা বিশাল স্থির বস্তুর অস্তিত্ব। একে কেন্দ্র করে সমস্ত নীহারিকাপুঞ্জ থেকে গ্রহ উপগ্রহরা সবই মাধ্যাকর্ষণের টানে ঘূর্ণায়মান। এই মাধ্যাকর্ষণের টানে ফল পড়ে মাটিতে, বস্তু বস্তুকে আকর্ষণ করে। তাঁরই ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে বল তত্ত্ব (Theory of Force) গতিবিদ্যা (Dynamics), ও কার্যকারণ সম্বন্ধ যুক্ত বস্তু-তান্ত্রিক দার্শনিক মতবাদ ; এমন কি, আদর্শবাদী (Idealist) দর্শনগুলিও তাদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নিউটনীয় বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য বিজ্ঞানাতীত দর্শন সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান-বর্ণিত জগৎকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু বস্তুর জাগতিক ব্যাখ্যায় এইরূপ আদর্শবাদীরা নিউটনকে অস্বীকার করেননি বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে চেষ্টা করেননি। পরবর্তী কালে নিউটনীয় বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার সময়ে দার্শনিক চিন্তাধারা ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়েছিল যন্ত্রবাদের দিকে। সব কিছুই যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত, সব কিছুই স্থির ও সীমাহীন একক দেশে বিধৃত, ও সব কিছুই বস্তু-ঘটিত—এই রূপ মতবাদই দর্শনে, সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় গৃহীত হচ্ছিল ব্যাপক ভাবে। রাজনীতি ও সমাজ জীবনও এই ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল।

তা' ছাড়া নিউটনের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল যান্ত্রিক জীবন—কলকারখানা, রেলগাড়ী, বিমান ইত্যাদি। ম্যাক্স্‌ওয়েলের বিদ্যুৎ তত্ত্বও গড়ে উঠেছিল এই ভিত্তিতে। তাতে করে সাধারণ্যে নিউটনীয় বিজ্ঞানের 'ধ্রুব সত্যতা'ই স্বীকৃত হয়েছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সুরুতে বিজ্ঞান-জগতে এমন কতগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকে, যা বৈজ্ঞানিক ভাবেই অস্বীকার করতে চেয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে নিউটনের

অবধারিত জগৎকে, অস্বীকার করতে চেয়েছে কার্যকারণ সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত জগতের আদর্শকে।

পরীক্ষামূলক ভাবে পরমাণু গঠনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে করে দেখা যায় অণুগুলি কতগুলি ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র; আর এই ইলেকট্রনগুলি তাদের পারস্পরিক ব্যবহারের সম্পর্কে নিউটনের যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করে না সর্বত্র; নিউটনের শক্তির সংরক্ষণ নীতিও (Conservation of Energy) অণুজগতের ক্ষেত্র সর্বত্র খাটে না।

পরমাণুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গতিশীল অণুর শক্তি বিভিন্ন অণুর মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সম্পূর্ণ ভাবে বিকিরণে পর্যবসিত হয় না। নিউটনীয় বিজ্ঞান অনুসারে এই রূপই হওয়া উচিত ছিল। ১৮৮৯-এ প্রকাশিত প্লাংকের কোয়াণ্টাম থিয়োরী আবিষ্কৃত হবার পর আমরা ক্রমে ক্রমে জানতে পারি রশ্মিও পরমাণুতে গঠিত এবং বিকিরণের সময় পরমাণু ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়; পরমাণু জগতে কার্যকারণ নীতি সর্বত্র খাটে না; বস্তুর পরিবর্তনও কোন নির্দিষ্ট ধারার অনুসরণ করে না; যান্ত্রিক নিয়মকে সমগ্র ভাবে খাপ খাওয়ানো যায় না পরমাণুর জগতে। অধ্যাপক বোড় বলেন, পরমাণুগুলি রেলগাড়ীর মত সোজা পথে চলে না, চলে ক্যাংগারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে।

১৯০৫-এ রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেন যে রেডিও অ্যাক্‌টিভ্‌ বস্তু আপনা থেকেই ভেঙে যায়। তাদের এই ভাঙনের কোন কারণ নেই। এই ভাবে বিজ্ঞানের দিক থেকেই কার্য-কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ জগতে থাকে।

১৯১৭-তে আইনষ্টাইন তাঁর একটি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পরমাণুর ব্যবহারের এই নূতন দিক ও কারণহীন রেডিও অ্যাক্‌টিভ্‌ বিকিরণ একই যোগসূত্রে গ্রথিত বলে ঘোষণা করেন। ১৯০৫-এ প্রকাশিত তাঁর

আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে দর্শকের দেখার উপর জগতের রূপ নির্ভর করে। বিভিন্ন গতিতে চলমান দর্শক বিভিন্ন জগৎকে দেখবে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে বাঁধা। জগতের কোন একক, ধ্রুব বা পরম সত্য-রূপ বৈজ্ঞানিকের মাপে ধরা পড়তে পারে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দর্শকের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য। এই বিপুল আবিষ্কার শুধু নিউটনের একক ও নির্দিষ্ট জগতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে বিচূর্ণিত করে নাই, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ধারণাকেও ভেঙেচুরে দেয়। এই আবিষ্কারে নিউটনের নিয়মগুলি শুধু মূলনীতির দিক থেকে ভুল বলে প্রমাণিত হয় না, জড় প্রকৃতির অনেক ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে গড়া সকল রকম চিন্তাধারারই উলটপালট হয়ে যায় আর নূতন বৈজ্ঞানিক পরিবেশে নূতন নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব হতে থাকে।

১৯১৫-তে প্রকাশিত আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনের সব চেয়ে বেশী পরিচিত আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে নাকচ করে দেয়। দেশ ও কালের মধ্যে বস্তু পারস্পরিক সান্নিধ্যের দরুন দেশে সৃষ্ট বক্রতার পথে অবলীলায় চলে আসে বলে ঘোষিত করা হয় বৈজ্ঞানিক ভাবে। এই মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বসুদ্ধ নিউটনের সব কিছু গৃহীত নিয়মই আপেক্ষিক, এ ধারণাটাই এ যুগের বৈজ্ঞানিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ যুগের সমস্ত চিন্তাধারার ভিত্তিই এই। জ্যামিতির ক্ষেত্রে এত দিন ইউ-ক্লিডের নিয়ম অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত হয়ে আসছিল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই দিয়েই সমগ্র জগৎ ও জগতের সমগ্র কিছুকেই পরিমাপ করা হচ্ছিল। আইনষ্টাইন অবতারণা করেন আর একটি পরিমাপের। তা হল কাল। মূল তত্ত্বের দিক থেকে কাল বাদ দিয়ে কোন কিছুরই পরিমাপ হতে পারে না আইনষ্টাইনের বিজ্ঞান অনুসারে। ইউক্লিডের

সরল রেখা নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বক্র, দুইটি সমান্তরাল রেখা এ যুগের ধারণায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।

এ যুগের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বস্তু পরিবর্তিত হয় শক্তিতে, শক্তি পরিবর্তিত হয় বস্তুতে; শক্তিও ভর-সম্পন্ন এবং শক্তি কণা-বিশিষ্ট ও তরঙ্গরূপী—দুইই; এ জগতে কিছুটা নিশ্চিত, কিছুটা অনিশ্চিত, কিছুটা সম্ভব, কিছুটা সম্ভব না হতে পারে।

অধিকতর জ্ঞান এর ভিতরকার নিয়মানুবর্তিতার বা সামঞ্জস্যের সন্ধান দিতে পারে না। কেন না এ হল পরীক্ষালব্ধ তথ্য, যা আবিষ্কৃত হয়েছে এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার মধ্য দিয়ে। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের শৃঙ্খলাপূর্ণ পথেই পরমাণু জগতের এই বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করেছে। এ দিকে ব্যাপক জগতের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির স্বরূপ কি জানা যায় না, শুধু তার পরিমাপ করা যায়। আইনষ্টাইন তাঁর সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে এই পরিমাপ দিয়েছেন বিভিন্ন দর্শকের দেখার ভিত্তিতে। গ্রহ তারকা নীহারিকা-খচিত আকাশপটে বিধৃত বিস্তৃত বহির্জগতের রূপ এ নয়, মানসপটে বিধৃত আদর্শবাদীর বিচিত্র জগৎও এ নয়; এ জগৎ নিছক মাপজোখের ও অঙ্কের হিসাবের। তিনি পরিমাপ করে দেখিয়েছেন দেশ ও কালকে, দেখিয়েছেন দেশ ও কাল পরস্পর বিজড়িত। এই বিজড়িত দেশ কালের রূপ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না, বিজ্ঞানও তার পরিচয় দিতে পারে না, পারে পরিমাপ দিতে, এবং সে পরিমাপও আপেক্ষিক।

দর্শকের গতিবেগের উপর তার দৃশ্যবস্তুর পরিমাপ নির্ভর করে; গতি-বেগের বিভিন্নতার উপর বিভিন্ন জগতের কাঠামো রচিত হয়। পৃথিবীর গতিবেগ ও নীহারিকার গতিবেগ এক রকম নয়; তাই এই দুই লোকের অধিবাসীর দৃষ্টিতে জগৎ ও এক রকম নয়; দুই ফ্রেমে আঁটা দুইটি ভিন্ন জগৎ।

পরম সত্তা বা একক জগতের ধারণা ভুল, অন্ততঃ দ্রষ্টাব দৃষ্টিতে। মানুষেয় জ্ঞান যতোই বাড়ুক না কেন সে তার নিজস্ব ফ্রেমেই আঁটা দেখবে জগৎকে। সে জগৎকে পরম সত্য বলে স্বীকার করা যায় না।

শুধু আইনষ্টাইনের আবিষ্কারই নয়, এই যুগের মূল বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারগুলিই সুস্পষ্ট ভাবে অস্বীকার করেছে নিউটনীয় যুগের সমস্ত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলিকে। প্লাংক্, বোড়, রাদারফোর্ড, হাইজেনবার্গ, দ্য' ব্রগ্‌লি, শ্রোডিংগার, ডিরাক্ প্রভৃতি এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের 'অনিশ্চয়তা', 'সম্ভাব্যতা' ইত্যাদি তত্ত্ব বস্তুজগতের অনিয়মানুবর্তিতারই পরিচয় দেয়। এই সবগুলিরই সমন্বয় সাধিত হয়েছে আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে।

এই নবযুগের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নূতন যুগদর্শন, যা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করেছে যান্ত্রিক জড়বাদী দর্শন ও চিন্তা-ধারাকে।

অবশ্য আইনষ্টাইন নিজে দার্শনিক ভাবে মনে করেন যে জগৎ সুনির্দিষ্ট ও নিয়মানুবর্তিত এবং নির্ণীত। তবে তিনি এও বলেন যে এর মূল অনুসন্ধান করতে হলে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করতে হবে নিছক বুদ্ধিগত ধারণার জগতে; অভিজ্ঞতার পথে এর হদিস মিলবে না।

জড়বাদী দর্শনের মৃত্যু ঘটলেও নিছক যুক্তিবাদী, সঙ্কল্পবাদী বা বাস্তব-সত্যবাদী দর্শনগুলি নূতন ভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছে; আলেকজাণ্ডার, এডিংটন, হোয়াইট্‌হেড, জিন্ ইত্যাদি নূতন যুগের দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক! এঁরা বিজ্ঞানের যুক্তির পথেই বিভিন্ন মীমাংসায় পৌঁচেছেন, এদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু সবারই যুক্তিতে আছে নিছক জড়বাদের অস্বীকৃতি।

এ যুগে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিজ্ঞানের ধারা সুস্পষ্ট ভাবে অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়; আর এই ধারার প্রবর্তন করেছেন ব্যাপক ভাবে আইনষ্টাইন। তাই তিনি যুগ মানব।

আইনষ্টাইনের জীবনী লিখতে গিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল এই যুগ মানবেরই ছবি, নিছক বৈজ্ঞানিকের নয়।

দক্ষিণ-পূর্ব জার্মানীতে—যেখানে ইলার নদী মিশেছে ড্যানিউবের সাথে, সেখানে একটি ছোট্ট শহর আছে—নাম উল্‌ম্‌। ছোটখাটো বন্দর একটি। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাহির থেকে বহু লোক এখানে এসে বসবাস করছে। হারমান আইনষ্টাইনও এখানে সপরিবারে বাস করছেন অনেক দিন। ইলেক্‌ট্রিকের একটা ছোটখাটো কারখানা আছে তাঁর এইখানে। তাঁর একটি ভাইও এই কারখানার অংশীদার। দক্ষিণ জার্মানীর কোনো একটা গ্রামে এদের আদিম বাড়ি। হারমান আইনষ্টাইনের স্ত্রীর জন্ম কান্‌স্টাট্‌ নামে একটা ছোট্ট শহরে....বিয়ের কিছুদিন পরেই এঁরা চলে আসেন উল্‌মে। ধর্মে এরা ইহুদী—কোন নির্দিষ্ট মাটির প্রতি টান এদের জাতিগত ভাবে নেই....অর্থ ও মনীষা—এই দুয়ের আকর্ষণ ও প্রেরণায় এরা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। হারমান আইনষ্টাইন সাহেব এলেন উল্‌মে—অর্থের সন্ধানে। গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়। ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র এই উল্‌ম্‌। এই উল্‌ম্‌ শহরেই একদা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-জ্যোতির্বিদ জোহানেজ কেপলার অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জন্মের দুশ' পঞ্চাশ বছর আগে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের চৌদ্দই তারিখের রাত্রে হারমান আইনষ্টাইনের ঘরে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন জন্ম গ্রহণ করেন। অ্যালবার্টের মা পলিন কি তখন জানতেন তাঁর এই পুত্রের প্রতিভা

কেপলারকেও ছাড়িয়ে উঠবে? অতি কাছেই কেপলারের বাড়ি—কত লোক এ বাড়ি দেখতে আসে….তীর্থস্থান যেন। আশ্চর্য! হারমান আইনষ্টাইন কিন্তু কেন জানি মনে করতে লাগলেন, তাঁর ছেলে এক দিন কেপলারের মত বড় হবে।

একটু একটু করে ছেলে বড় হতে লাগল। বেশ মোটাসোটা গড়ন। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেল, ছেলেটি কথা যেন কেমন করে বলে—বোকা হবে না কি শেষটায়! হারমান সাহেব ডাক্তারও দেখালেন…'কিন্তু না, ডাক্তার যাই বলুক, ছেলে আমার খুব মাথাওয়ালা হবে—কেপলারের মত।' যারা বড় হয় শিশুকালে তারা একটু বোকাটে ধরণের হয়ও অনেক সময়। অ্যালবার্টের জন্মের পর বার বছর কাটলো তাঁদের উল্‌মেই। এই ছোট শহরে ব্যবসায় বেশি বাড়ানো যায় না। তারপর ছেলে বড় হচ্ছে, ওর লেখাপড়া তো আছে! তাই আইনষ্টাইন পরিবার চলে এল বড় শহর ম্যুনিকে বড় কারখানা খোলবার আশায়। তাঁর ভাই, অ্যালবার্টের খুড়ো জ্যাকও এলেন…. তিনিও অংশীদার কি না। তা'ছাড়া অ্যালবার্টের প্রতি তাঁর খুব স্নেহ।

আইনষ্টাইনদের ব্যবসায় এখানে বেশ বাড়তে লাগল। প্রথম এসে ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন এঁরা….কিছু দিনের মধ্যে শহরের উপকণ্ঠে বড় একটা বাগান বাড়ি কিনলেন।

আইনষ্টাইনরা এখন বড় লোক, একথা বলতে হবে। তাঁদেরই বাড়ির ছেলে অ্যালবার্ট—চার পাঁচ বছর বয়স হয়েছে। সবাই কিন্তু বলে ছেলেটির বেশ মাথা, বাপও তাতে খুশি; কিন্তু খেলাধূলায় ওর মন নেই একটুকুও…যা পায় তাতেই খুশি; কোনো ছেলে তার সাথী নেই—কিচ্ছু না; কেবল একা থাকতে ভালবাসে, একা একা ঘোরে।

এক দিন ওর বাবা ওকে একটা কম্পাশ এনে দিয়েছিলেন খেলা করবার জন্য। কেন না তিনি জানতেন, তাঁর ছেলে এই ধরণের জিনিসই ভালোবাসে। কম্পাশ নিয়ে সে ভুরু কুঁচকিয়ে ভেতরটা দেখতে লাগল…কাঁটাটা এই ভাবে একমুখো হয়ে থাকে কেন? বাবাকে কত প্রশ্নই সে করল। অনেকক্ষণ কত কি সে ভাবল আপন মনে। ছেলের এই ভাবটা বাবার ভালো লাগে….লোককে ডেকে বলেও ছেলের এই বিশেষত্বের কথা।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হতেই ছেলেটির আশ্চর্য ঝোঁক দেখা গেল অঙ্কশাস্ত্রের দিকে…বিশেষ করে বীজগণিত তার ভয়ঙ্কর ভালো লাগে। খুড়ো জ্যাক্ ওর মাস্টারির ভার নিলেন…তিনি তাকে শেখালেন, যখন কিছুকে বুঝতে বা জানতে পারবে না, তখন ঐ না-জানা বস্তুকে ধরে নেবে X বলে….তারপর মাথা খাটাও X টা কি তা আবিষ্কার করতো ছাত্রও বুঝলে ঠিক‥ দশ বৎসর না হতেই তার বোঝার গতি এত বেশি বেড়ে গেল যে, মাস্টার মশায়েরই তাকে বোঝানোর ক্ষমতা রইল না। অ্যালবার্ট নিজের প্রয়োজনে নিজেই আবিষ্কার করলে একটা ত্রিকোণের দুই ভুজের পরস্পরের ঠিক সম্বন্ধটা কি, বিনা সাহায্যেই পিথাগোরীয় উপপাদ্য প্রমাণ করলে ; তারপর বীজগণিতের আরো কত কড়া বিষয় নিয়ে অঙ্ক কষতে লাগল সে, যা ঐ বয়সের ছেলের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক।

ছেলেকে ইতিমধ্যে স্কুলে ভরতি করা হয়েছে। অঙ্ক নিয়ে সে খুব হিজিবিজি করে বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় মোটেই ভাল নয়। মাস্টারদের রিপোর্ট তাই। ছয় বৎসর বয়সে সে পাঠশালায় ভরতি হয়, মাইনর স্কুলে ভরতি হয় নয় বৎসর বয়সে। কী সব কড়া নিয়মকানুন এই মাইনর স্কুলটায়! মাস্টাররা যাই বলবে, তাই করতে হবে, যা ভাল লাগবে না তাই পড়তে হবে। মুখস্ত কর, বাড়ি থেকে টাস্ক্ করে

আনো, ড্রিল কর,—বাবা ! তার পর শিখ কড়া কড়া ভাষা !....আর যা অঙ্ক ! ও গুলিতো ছোট বোন মাজাও কষতে পারে ! অ্যালবার্টের একটি বোন হয়েছে—এখনও দুগ্ধপোষ্য। সব চেয়ে কড়া হল জার্মান ভাষার মাস্টার—যেন মিলিটারী কম্যাণ্ডার !

অবশ্য এ সব কথা অ্যালবার্ট মুখে বলত না, এই নিয়ে মাথাও ঘামাতো না। তার ভাল লাগতো না এই সব, এই আর কি....

ছেলেটি ছিল একটু মুখচোরা গোছের ; কথাও বলে খুব ধীরে ধীরে ; প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারে না। একটু বোকাটে বৈকি ! তা ছাড়া গ্রীক লাটিন—কিছু বোঝে না সে। তবে হ্যাঁ, অঙ্কের মাস্টার বলে, অঙ্কে না কি ওর আশ্চর্য মাথা—একেবারে কলেজের ছেলের মত !....তা অঙ্ক দিয়ে কি ধুয়ে খাবে, যদি বুদ্ধিই না বাড়ল, লেখাপড়াই না শিখল ! প্রায় সব মাস্টারেরই এই মত। কিন্তু রুয়েস্ বলে একজন মাস্টার কিন্তু ছেলেটিকে অন্য চোখে দেখেন। ডেকে ডেকে তাকে বলেন গ্যেটে, সেক্স্পিয়ার, শিলারের কথা।...ছেলেটি এই সব কাহিনীতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই সব মনীষীদের কাহিনী তার অন্তরের গভীরতায় দোল দেয়। যেন কোন অদৃশ্য যোগসূত্রে তার মন তাঁদের মনের সাথে গ্রথিত...স্কুল মাস্টার রুয়েস্ কি বালক আইনষ্টাইনের মুখে গ্যেটে, শিলারের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন !

বালক আইনষ্টাইনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে বীজগণিতের সমস্যার মধ্যেই বেশির ভাগ। সাথী নেই, বন্ধু নেই। তার মন ও রুচির দিক থেকে কারো সাথে মিশতে পারে না সে। আর বিশেষ করে সে জাতিতে ইহুদী ব'লে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র তাকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। রোমান ক্যাথলিক স্কুল....ওখানে বাইবেলও পড়ানো হয়, খ্রীষ্ট ধর্মের আনুসঙ্গিক অনেক অনুষ্ঠানই ঘটে। আইনষ্টাইনের তো ওদের ধর্ম খারাপ লাগে না !

যীশু খ্রীষ্ট তো সত্যিই মহামানব! তবে ইহুদীদের ওরা ঘৃণা করে কেন! সেই আদিম যুগে কতগুলি ইহুদী খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল বলে? তার জন্যে এযুগের ইহুদীরা দায়ী হবে কেন! ইহুদীদের ধর্ম তো খ্রীষ্ট ধর্মের মতই সুন্দর। কি সুন্দর সমন্বয় হতে পারে দুই ধর্মের। স্কুলে তো বাইবেল পড়ে সে, বাড়িতে পড়ে ইহুদী ধর্ম গ্রন্থ—অনুসরণ করে ইহুদী আচার-ব্যবহার, কই কোথাও তো সংঘর্ষ বাধে না! তার পিতামাতাও তো কত উদার! কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের উপাসক হয়েও খ্রীষ্টানরা এত অনুদার হয় কেন! বালক আইনষ্টাইনের মনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগে জগৎ সম্বন্ধে…সব কিছুই প্রথমটায় তার দৃষ্টির সম্মুখে X হয়ে দাঁড়ায়। সমাধানী মন উত্তর খোঁজে। বীজগণিতের সমস্যার মত জীবনের অন্যান্য দিকের প্রশ্নের উত্তর সে তার বালক মন দিয়ে খুজতে থাকে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে থাকে।

অ্যালবার্টের যখন এগারো বছর বয়স, তখন তাদের বাড়িতে ম্যাক্স্ টালমে নামে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ঘন ঘন বেড়াতে আসত। অ্যালবার্টের চেয়ে এগারো বছর বড় সে। বন্ধুহীন অ্যালবার্টের সাথে এই ডবল-বয়সী ছেলেটির বন্ধুত্ব হয়ে গেল গভীর ভাবে। কোথায় যেন মানসিক মিল্ এরা আবিষ্কার করতে পেরেছে। এরা কথা বলে গভীর জিনিস নিয়ে। অ্যালবার্টকে কত সব নূতন জ্ঞানের কথা শুনায় টালমে। অ্যালবার্টের কিশোর জীবনে এই তরুণের প্রভাব কম নয়। অঙ্কশাস্ত্রে অ্যালবার্টের ঝোঁক আছে দেখে সে তাকে একদিন উপহার দিলে একখানা জ্যামিতি…অ্যালবার্ট এই নিয়ে খুব কয় দিন রেখা আর বৃত্ত আঁকলে। এই জ্যামিতির বিষয়বস্তু অল্প দিনেই তার আয়ত্ত হয়ে গেল। এ ধরণের বই পেলে সে খুবই খুশি হয়। গল্পের বই,

ভ্রমণকাহিনী—এসব তার ভাল লাগে না। বিজ্ঞানের বই—পদার্থ বিজ্ঞানের বই তার খুব প্রিয়। তের বছর বয়স হতে তার আবার দার্শনিক বই পড়ার দিকে ঝোঁক গেল। কান্টের Critique of Pure Reason তার ঐ বয়সেই পড়া হয়ে গেল।

১৩।১৪ বছরের ছেলে—স্কুলের ছাত্র—লেখাপড়ায় ভাল নয়। স্কুলের খারাপ ছেলে হিসেবে আর ইহুদীদের ছেলে বলে বিদ্যালয়ের আবহাওয়াতে সে সামান্যই স্নেহপ্রীতি অর্জন করতে পেরেছিল। তার স্বাচ্ছন্দ্য সে খুঁজে পেত নিজের গৃহের আবহাওয়ায়। ম্যুনিকের উপকণ্ঠের বাগান বাড়িতে সচ্ছল অবস্থার পরিবেশে বালক আইনষ্টাইনের দিনগুলি বেশ কাটছিল। বাবা, মা, কাকা, বোনের মধ্যে সে ছিল অন্তরঙ্গ....টালমের মত রুচিসম্পন্ন বন্ধুও তার ছিল, আর ছিল ম্যুনিকের উপকণ্ঠের নির্জনতা··· বড় বড় গাছ, আলোছায়াকীর্ণ পথ। নির্জনতায় তার মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করত ছন্দোবদ্ধ ভাবে বীজগণিতের দুরূহ কোন সমস্যা, হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্, সপ্তর্ষি তারকার প্রশ্নের ইঙ্গিত। সবগুলি কথারই সুস্পষ্ট উত্তর সে পেত না বটে, কিন্তু তার মন ও বুদ্ধির আকাশে ঐ প্রশ্নগুলি নিরন্তর ছুটাছুটি করত মধু-মক্ষিকার মত।

তার প্রতিভার বিকাশের পথে পারিবারিক আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এত দিন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল—পারিবারিক আর্থিক অবস্থার। মানস ও মস্তিষ্ক লোক থেকে তাকে অতটুকু বয়সেই চলে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের মাঝে।

ম্যুনিকে তার বাবার ক্রম-বর্ধমান ইলেকট্রিক্ কারখানার কাজের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল। তখনকার রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিও এই জন্য অনেকটা দায়ী। দ্রুত তাঁরা নেমে এলেন

আকস্মিক টানাটানির মধ্যে। আহার সংস্থানের উপায়ও বন্ধ হয়ে যায়, এই রকম। ইহুদী তাঁরা—মাটির টান নেই। ভাগ্যান্বেষণে হারমান আইনষ্টাইন সপরিবারে চলে এলেন ইটালীতে—মিলানে। শুধু অ্যালবার্ট রইল ম্যুনিকে পড়াশুনা চালাবার জন্য। এক বৃদ্ধা মহিলা তাকে খরচ দিয়ে রাখলেন। অ্যালবার্টের বয়স এখন পনর বছর। জীবনে সে এই প্রথম রইল একাকী। যে সঙ্গশীলতার আবহাওয়া ছিল তার পারিবারিক জীবনে, সে আবহাওয়া আর নেই। টালমেও এখন আসে না। বাইরের দিকে স্কুলে জীবন! ওঃ কি ভয়াবহ সে!....ছয় মাস তবু তার কেটে গেল এই ভাবে বিরক্তি ও একাকীত্বের মধ্যে....মা বাপের জন্য মনও কেমন করে তার...না, মিলান থেকে সে একবার ঘুরে আসবে এখনই···মিলান! ইটালীর অতীতের ইতিহাস ও শিল্পবিজড়িত ইটালী—আজকের সৌন্দর্যময়ী প্রাকৃতিক ইটালী! তার কচি মনকে আহ্বান করল ইটালী—তার বালক মনকে আকর্ষণ করল পিতামাতা, বোন মাজা। কিন্তু কি করে যাওয়া যায়! যে কড়া হেড্ মাস্টার! ছুটি তো দেবে না! একজন ডাক্তারের কাছ থেকে মিথ্যা একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করে নিয়ে সে স্কুলের কর্তাদের কাছে আবেদন জানালো যে তার ভারি অসুখ—স্নায়বিক ব্যারাম—অন্তত কিছু দিন ছুটি চাই। ছুটি মঞ্জুর হল।

অবশ্য আইনষ্টাইনের মত ভালো ছেলের পক্ষে ছলনার সুযোগ নেওয়া স্বাভাবিক নয়। এই জন্য সে অনেক ভেবেছ, অনেকবার পিছ্পাও হয়েছে; কিন্তু মনের টান প্রবল হয়ে জাগল····আইনষ্টাইন স্কুল থেকে বিদায় নিলে। মন তার অবশ্য খুস্খুস করতে লাগল খুব একটা অন্যায় করার অনুভূতিতে।

মিলানের প্রাকৃতিক ও পারিবারিক আবহাওয়ায় জীবন তার ভরে উঠল। স্কুলের দেওয়াল নেই চারিদিকে—উন্মুক্ত উদার আকাশ—সম্পূর্ণ

মুক্তির অনুভূতি...ছ'টা মাস সে কাটিয়ে দিলে এই জায়গায়। প্রকৃতিকে তার ভালো লাগল, সৌন্দর্য্য-সন্ধানী মন শিল্পী হয়ে উঠল....

এইখানে তার বাবার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল না। এখানেও ইলেকট্রিকের ব্যবসায় খুলেছিলেন তিনি। প্রথমে মিলানে, তারপর পাভিয়াতে তিনি কারবার খোলেন। এক রকম চলে যাচ্ছিল তাঁদের আর্থিক দিনগুলি এই পাভিয়ায়। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলবে! আইনষ্টাইন এখন বড় হয়েছে। তার এখন পাসটাস করে চাকরিবাকরি যোগাড় করা দরকার। হারমান আইনষ্টাইন মানসিক ভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছেন। ছেলের সম্বন্ধে বিরাট কিছু কল্পনা আর রাখেন না। তবে হ্যাঁ, নিজের যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের দিকে ঝোঁক আছে, তখন ছেলেটি যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, তা হলে মন্দ হয় না। বেশ কার্যকরী শিক্ষা, ব্যবসায়ও খুলতে পারবে ইচ্ছা করলে। কিন্তু ছেলেটি নেহাতই মানস ও মস্তিষ্ক লোকে বিচরণ করে। বাবা তা বুঝবেন কি করে! নিজেতো প্র্যাকটিকাল মানুষ।

যাক পড়াশুনা করতেই হবে। আইনষ্টাইন কিন্তু সত্যি একটা প্র্যাকটিকাল বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল ম্যানিক থেকে আসবার সময়। সে একজন স্কুল মাস্টারের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট এনেছিল। তাতে মাস্টার মশাই তার অঙ্কে ভয়ানক মাথা আছে বলে লিখেছেন। এই মাত্র সম্বল। এরই জোরে হয়তো স্কুলে ভরতি হতে পারে উঁচু ক্লাসে। দেখা যাক।

ইটালী যেন ঠিক পড়াশুনা করবার জায়গা নয়। মুক্তির স্পৃহা আর কবিতার অনুভূতি—এই নিয়ে যেন লোকে এখানে বেঁচে থাকতে চায়। তা'ছাড়া জার্মান-জানা ছেলের পক্ষে এখানে পড়ার ব্যবস্থাও হয় না। জার্মানী আর ভাল লাগে না, মুনিকের স্কুলতো নয়ই। সুইজারল্যাণ্ডের

জুরিখে যাওয়া যাক। সেখানে জার্মান ভাষায় পড়ানো হয়। জুরিখের যে স্কুলে ভরতি হতে সে এল, তার নাম পলিটেকনিক অ্যাকাডেমি। অ্যালবার্ট মাট্রিক পাস করে আসেনি। অ্যাকাডেমিতে ভরতি হতে হলে ম্যাট্রিক পাস থাকা চাই। কিন্তু অ্যাকাডেমির কর্তারা যদি তাকে পরীক্ষা করে নেন, তবেতো হতে পারে! পরীক্ষা সে দিলে। পদার্থবিদ্যা আর অঙ্ক শাস্ত্রে অনেক নম্বর সে পেল। কিন্তু ভাষায় আর প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একেবারে ফেল! অতএব কি করে তাকে আর ভরতি করা যায়! তবে ছেলেটির মাথা আছে…'কাছাকাছি কোন স্কুল থেকে পাসটা করে এস, পরে তোমায় ভরতি করে নেব', বল্লেন অ্যাকাডেমির কর্তারা। কি আর করা যায়! একত্রিশ মাইল দূরে আড়াও বলে একটা ছোট সুইজ্ শহরে পড়াশুনা করতে গেল সে। বেশ ভাল স্কুলটি। মাস্টাররাও জাঁদরেল নয়; স্বাধীনতাও এখানে আছে প্রচুর। এখন প্রায় ষোল বছর বয়স হয়েছে তার; কিছু ঘোরাফেরাও করেছে সে; এখন অত লাজুক থাকলে চলবে কেন! ওভাবটা তার অনেক কমে গেল এখানে এসে। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও তার জুটলো এখানে। ভিয়িন্টেলার নামে একজন শিক্ষকের বেশ ভাল লেগে গেল এই ছেলেটিকে ওর বিশেষত্বের জন্য। অ্যালবার্ট প্রায়ই যেত এই শিক্ষকের বাড়িতে। তার আর একটা কারণও ছিল কিন্তু। প্রায় ষোল বছর তো বয়স হলো—এবার একটু রোমান্টিক হলে দোষ কি! ইটালীর সৌন্দর্য যার অত ভাল লাগে, মাস্টার মশায়ের সুন্দরী কিশোরী মেয়েটিকে তার যদি ভালো লেগে যায়, তাতে এমন দোষটা কি হল! তরুণ আইনষ্টাইন শুধু মস্তিষ্কের কারবারই করে না, মনের কারবারও করে। এই মেয়েটির ভাইও ছিল তার বন্ধু…এই বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার ফলে প্রত্যক্ষ লাভটি হলো কিন্তু মেয়েটির ভাইয়েরই। এই বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে দুই পরিবারের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল, তারপর আত্মীয়তা…

বন্ধুবর বিয়ে করলেন অ্যালবার্টের বোন মাজাকে। বিয়ের আগে অবশ্য প্রেম চলেছিল কয়েক দিন....আর আইনষ্টাইন, লাজুকতা যতোটা দূর হোক না কেন, একটা মেয়ের কাছে প্রপোজাল দেওয়া...দূর, তা কি সম্ভব! অতএব এই দিকের বিয়েটা সম্ভবপর হলো না...

যাকৃগে, পরীক্ষায় পাস করতে হবে। খেটেখুটে খুব পড়াশুনা করে পাস সে নিশ্চিতই করলো। তবু ভাষায় পেল কম নম্বর। ফিরে এল জুরিখে। অ্যাকাডেমির প্রবেশপত্র সে পেয়েছে—ম্যাট্রিকুলেসন সার্টিফিকেট। তা ছাড়া আগেরই জানাশোনা মেধাবী ছেলেটি....

এই অ্যাকাডেমীতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন অঙ্ক শাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায়। এখন থেকে তাঁকে আপনিই বলব....কেন না এই সময়ে তাঁর মনে প্রথম আপেক্ষিক তত্ত্বের বীজ বপন হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের সুরু হল এবার....

কিন্তু জুরিখ অ্যাকাডেমির লেবরেটারিতে যে-সব যন্ত্রপাতি আছে, আইনষ্টাইনের প্রয়োজনে-তা যথেষ্ট নয়। এখানে যা পড়াশুনা হয়, তার অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন তিনি। আরো উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের আবহাওয়া তাঁর চাই। কিন্তু তা বলে অন্য জ্ঞানের বিষয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল না, একথা নয়। অত্যন্ত ব্যগ্রতার সাথে তিনি দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়তে থাকেন...শ্যপেনহাওয়ের, ডারউইন, হিউম, বার্কলে—এদের লেখাও পড়েন প্রচুর।

চার বৎসর তিনি এই অ্যাকাডেমিতে ছিলেন। বয়সও বাড়ছে এখন। মস্তিষ্ক জগৎ যেমন প্রসারিত হচ্ছে তাঁর বিপুল বিস্তৃতিতে, সামাজিক জীবনে তাঁর অতটা ব্যাপ্তি গড়ে ওঠার কারণ না থাকলেও, এই সময় আইনষ্টাইন বেশ সামাজিক মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁর

এখন—কলেজের ছেলেমেয়ে ছাড়াও কেউ কেউ। সার্বিয়া থেকে আসা একটি ছাত্রী—মিলেভিয়া মারিক তাঁর ক্লাসে পড়ে। অঙ্কে তার ভারি ঝোঁক। দুজনকেই এক সঙ্গে অনেক সময় অঙ্ক নিয়ে বসতে হত…. অঙ্কশাস্ত্রে সহযোগী এই মেয়েটি আইনষ্টাইনের মানসিক সহযোগী হয়ে পড়েছিল ক্রমে ক্রমে…অ্যাকাডেমিতে পড়তে পড়তেই তাঁরা ঠিক করলেন, পরস্পরকে বিয়ে করে ফেলবেন।

এই সময় অঙ্কের ক্লাসের একটি ছাত্র মার্শেল গ্রস্‌মানের সাথে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। ইনিও ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হিসাবে নাম করেছিলেন। ফ্রেডারিক অ্যাডলেয়ার নামে একটি অস্ট্রিয়ান ছাত্রের রাজনৈতিক মতামত তাঁর ভালো লাগত। ছেলেটি ছিল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট….আন্তর্জাতিকতা-পন্থী আইনষ্টাইনের কাছে সে ছিল একটি আদর্শ ছেলে। রাজনীতির সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকলেও মতবাদের দিক দিয়ে আইনষ্টাইনও ছিলেন অ্যাডলেয়ারের দিকে।

অনেক বছর পর, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অ্যাডলেয়ার অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টুর্গরকে হত্যা করেন তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী আদর্শের অনুপ্রেরণায়।

এই তরুণ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন ছিলেন একজন ওস্তাদ সুরশিল্পীও। বিজ্ঞান ও আর্টের দ্বন্দ্ব বাধেনি তাঁর জীবনে। এই দুইই তাঁর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল পূর্ণতার দিকে। খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। মোজার্টের মত স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর এ সঙ্গীত-প্রতিভা। মোজার্টের মত শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী বলে পরিচিত থাকতে পারতেন তিনি, যদি বিজ্ঞানের প্রবল আকর্ষণ তাঁর না থাকত। তবুও আইনষ্টাইন একজন প্রতিভাবান সুর-রসিক ও স্রষ্টা….

জুরিখে থাকবার সময় তিনি বিজ্ঞানের সাথে সাথে উচ্চ-সঙ্গীত

চর্চাও করতেন। এই সময় তিনি প্রায়ই গীতিনাট্য দেখতে যেতেন প্রেক্ষাগৃহে। কিন্তু সব সময় তাঁর টিকিট কিনবার পয়সা থাকতো না। তখন নির্জন অবসরে তিনি সুরের তরঙ্গ তুলতেন তাঁর বেহালায়··· আপনার সঙ্গীত-লোকে তিনি আনন্দের প্রচুর আস্বাদ পেতেন। তাঁর নির্জন অবসর ভরে উঠতো সুরে, তাঁর পড়াশুনা ও গবেষণার ক্লান্তি কেটে যেতো আপন সৃষ্ট সুরের স্নিগ্ধ প্রলেপে। কিন্তু বিজ্ঞান ও সুর ছিল তাঁর মস্তিষ্ক-লোক ও অন্তর-লোকের। আর প্রতিদিনের জীবন! বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় ক্লিষ্ট সাধারণ দৈনন্দিন জীবন! জুরিখের এই পাঠ্যাবস্থায় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই আইনষ্টাইনের দিনগুলি কেটেছে। বাবার পক্ষে টাকা পাঠানো অসম্ভব। ব্যবসায় ক্রমশঃ খারাপ হয়েই চলেছিল, এখন তা চরমে পৌঁছেছে। নিজেদের আহারের সংস্থান করাই মুশকিল, ছেলেকে টাকা পাঠাবেন কোত্থেকে? শুধু কয়েকজন আত্মীয়ের দয়ায় আইনষ্টাইন তাঁর পড়াশুনায় অগ্রসর হতে পারছিলেন তখন। তাঁরা তাকে পঞ্চাশ টাকার মত পাঠাতেন। ধন্যবাদ তাঁদের। নিজেদের অজ্ঞাতসারে শুধু আত্মীয়তার খাতিরে তাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁরা হয় তো জানতেন না যে, কত বড় একটা প্রতিভাকে মুকুলিত হতে তাঁরা দিয়েছেন সামান্য জলসিঞ্চন করেও। এই টাকাটা থেকে আবার প্রতি মাসে গোটা দশেক টাকা তাঁর দিতে হত সুইজ্ সরকারকে। ইতিমধ্যে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকার চেয়ে সুইজ্ বলে স্বীকৃত হবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। এই অধিকার লাভের জন্য তাঁকে দশ টাকা হিসাবে দিতে হত মাসে মাসে।...এ সামান্য টাকায় তাঁর পড়াশুনা, থাকা খাওয়া চলত না, টিউশনি ছিল একটা আয়ের উপায়। তাও, আবার সব সময় জুটত না।

অবশ্য তাঁর মত লোকের কাছ থেকে বাজে খরচ আশা করা যায় না।

কাপড়চোপড়ে বা অন্য ভাবে তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ হত না। মেয়েদের পিছনে পয়সা খরচ করবার সময় ও মনোভাব—কোনটাই তাঁর ছিল না। তবে হ্যাঁ, নারীসঙ্গ তাঁর ভাল লাগতো বটে; কিন্তু তার জন্য তাঁর কারো পিছন নিতে হতো না। অ্যাকাডেমির নাম-করা ছেলে—চেহারাখানা বেশ—প্রতিভাদীপ্ত মুখ···মেয়েরাই কৃতার্থ হত যদি সঙ্গ পেত তাঁর। কিন্তু আইনষ্টাইন দুই একজন ছাড়া কাউকে আমল দিতেন না।

যা হোক, এসব ব্যাপারে না হয় তাঁর পয়সা খরচ হত না; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও তো উপযুক্ত আহার্য চাই। মাথার কাজ তাঁর অনেকক্ষণ ধরে করতে হয়; ভালো খাদ্য না পেলে স্বাস্থ্য টিকে থাকবে কেন? খাদ্য তাঁর জুটতো না ভাল। ফলে সেই সময়টা যা'হোক এক রকম কেটে গেল। পরে অনেক দিন ধরে তাঁকে পাকস্থলীর গণ্ডগোলে ভুগতে হয়েছিল!

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। এখন একটা চাকরিবাকরি যোগাড় করতে হবে। এত দিন এক আত্মীয়ের দয়ায় চললো। এখন তিনি পাস করেছেন, পড়াশুনা আপাততঃ স্থগিত, এখন শুধু নিজের জীবন ধারণের জন্য টাকা তো তিনি চাইতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, এমন একটা কাজ চাই, যাতে তাঁর অন্ন-সংস্থান হয়, এবং অবসর মিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবার জন্য।

লেখাপড়ায় আইনষ্টাইন ভালো ছিলেন। তাঁর পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ঐ অ্যাকাডেমির অধ্যাপকদের জানা ছিল। দুই একজন দায়িত্বশীল অধ্যাপক তাঁকে বলেছিলেন যে, গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর তাঁকে ঐ অ্যাকাডেমিতেই একটা সহকারী অধ্যাপকের পদে বহাল করবার বন্দোবস্ত করা যাবে। এই ভরসা নিয়েই তিনি চাইলেন ঐ অধ্যাপকের পদ ডিগ্রি পাবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নিরাশ হলেন তিনি। কয়েকজন

অধ্যাপকের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই চাকরি তাঁর হল না। কারণ জাতিতে তিনি ইহুদী। ইহুদী-বিদ্বেষ চিরকালই ইয়োরোপে প্রবল। স্বার্থের প্রশ্নে এলেই এই বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। ইহুদীদের আর্থিক সাচ্ছল্য যতটা খ্রীষ্টান ইয়োরোপিয়ানদের অসহ্য, তার চেয়ে আরও অসহ্য তাদের প্রতিভা। শিক্ষায়, কালচারে এবং প্রতিভায় ইয়োরোপের ইহুদীরা শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকে, যত রকম বাধাই সৃষ্ট করুক না খ্রীষ্টানরা অতীত ইতিহাসের ঘটনার রেশ টেনে।

চাকরিটি না পাওয়াতে বেকার অবস্থায় ছ'টা মাস কেটে গেল আইনষ্টাইনের। দারিদ্র্যের বেড়াজালে আটকে পড়ে অনিশ্চয়তা ও নিরুৎসাহের মধ্যে তাঁর দিনগুলি কাটাতে লাগল। অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করে কিছু কিছু সাহায্য পেতে লাগলেন তিনি ইহুদীদের কাছ থেকে। ঐ দিয়েই দিন গুজরান হতে লাগল—অতি কষ্টে তো নিশ্চয়। তারপর ভাগ্যক্রমে তিনি একদিন একটা ভালো স্কুলমাস্টারির কাজ পেলেন ভিনটাতুর নামক একটি শহরের টেকনিকাল স্কুলে। জুরিখ থেকে সতর মাইল দূরে এই ছোট শহরটি অবস্থিত।

আইনষ্টাইন এসে দেখলেন, এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। বয়সে ছোট এই তরুণ মাস্টারটিকে তারা মানতেই চায়নি প্রথমে। কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে মাস্টারের বন্ধুত্ব হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। তারা তাঁকে ভালবাসতে শিখল। ভালবাসা থেকে যে সম্মান এল সে আরও গভীর ও সুন্দর। আইনষ্টাইনের প্রতিভাদীপ্ত সাহচর্যে টেকনিকাল স্কুলের বয়স্ক ছাত্রদের মনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এর কয়েক মাস পরে তিনি চাকরি জোটালেন সাফ্‌হাউজেন নামক একটা জায়গার এক স্কুল মাস্টারের বাড়িতে। চাকরিটা পেয়েছিলেন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে। পত্রিকার 'সাহায্য চাই' কলামে তিনি বিজ্ঞাপন

ছাপিয়েছিলেন। প্রাইভেট টিউটরের চাকরি, একজন মাস্টার চাই—দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে।

এইখানে টিউশনি করে তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল ভালোই। যদিও বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ তাঁর মিলছিল না লেবরেটারির অভাবে, তবু কাগজপত্রে অঙ্কের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিস্তর সময় তিনি এখানে পেতেন। যা হোক, এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। ছেলে দুটি বেশ ভাল, খুব খবর জানতে চায়, পড়াশুনায়ও খুব আগ্রহ। আইনষ্টাইনতো এই রকম ছেলেই চান। বিশেষ করে ছোট ছেলেটি ছিল খুবই উৎসুক। এর সঙ্গে আইনষ্টাইনের খুবই ভাব হয়ে গেল। কিন্তু এই ভাবটাই হলো কাল। ছেলেদের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আপনার ধারণামত তিনি ওদের বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন যে, ওদের উপর যেন কোন বাধানিষেধ আরোপ করা না হয়—ওরা যাতে সব সময় তার নিজের কাছে থেকে পড়াশুনা করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়... প্রস্তাবটা স্কুল মাষ্টারের সন্দেহজনক মনে হল। নিশ্চয় প্রাইভেট টিউটর ছেলেটিকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছে! সন্দেহ যখন হল, আর দেরি নয়। তক্ষুনি তিনি আইনষ্টাইনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন। মস্তিষ্ক-ও-মানস-লোকবাসী তরুণ বৈজ্ঞানিক-শিল্পী কিছু বুঝলেন না এর অর্থ। ভাল করতে গিয়ে এরকম বিপরীত ফল হবে, তা তিনি আশা করতে পারেননি।

আবার নেমে এলেন তিনি পথে কপর্দকহীন। তবু ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে বাঁচিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত হয়ে রয়েছিল আড়ালে আড়ালে। ভগবান কি দৃষ্টি রাখতেন তাঁর দিকে?...জুরিখে এক ক্লাসের সাথী ছিলেন মার্শেল গ্রস্‌মান। তিনি তাঁর বাবাকে বলেন আইনষ্টাইনের জন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করবার জন্য। গ্রস্‌মানের বাবা তাকে বার্ণের

কন্‌ফিডারেট পেটেন্ট্‌ অফিসের ডাইরেক্টার হালেরের কাছে চিঠি লিখে জানান যে, 'সত্যিকারের একটি প্রতিভাবান ছেলে কপর্দকহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের পথেঘাটে; যদি সম্ভবপর হয়, তুমি তার একটা অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা কর।'

অকস্মাৎ আইনষ্টাইন হালেরের নিকট হতে একখানা প্রীতিপূর্ণ চিঠি পেলেন। তাঁকে আহ্বান করা হ'য়েছে বার্ণে দেখা করবার জন্য। সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ—মস্ত বড় শহর। ডাইরেক্টার হালেরের সাথে আইনষ্টাইনের দেখা হতেই তিনি তাকে সন্তুষ্ট-চিত্তে একটি চাকুরি দিলেন পেটেণ্ট পরীক্ষকের কাজে। মাইনে অতি সামান্য। তা হোক, মাথা গুজবার মত ব্যবস্থা হলো তো! কাজে যোগ দেওয়ার সময়টা ছিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎ কাল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এখানে ঐ চাকুরিতে বহাল ছিলেন। তারপর অকস্মাৎ চাকুরিটি চলে যায়। চাকুরিটি অবশ্য ছিল একেবারে রুটিন-করা; খুব খাটতে হত তাঁকে। আইনষ্টাইন নিজেই বলতেন, 'এ যেন মুচির কাজ'। কিন্তু এই 'মুচির কাজটি'কে তিনি ঘৃণা করেননি। এই চক্রবদ্ধ প্রচুর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি যেটুকু অবসর পেতেন, সেই অবসরে মুক্তির সন্ধান করতো তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মন; সামান্য অবসরের ফাঁকে সুশৃঙ্খলায় আত্মপ্রকাশ করতো তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া গবেষণার প্রচুর সময় বা উপযুক্ত আবহাওয়া তিনি পেতেন না ওখানে; কিন্তু যেটুকু সময়ে পেতেন, সে সময়টুকুতে তীক্ষ্ণ ভাবে, তীব্র ভাবে তাঁর উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করত।

আইনষ্টাইন এখানে যে সামান্য মাইনে পেতেন, তাতে তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অনায়াসেই বাহিত হত। অবশ্য সপরিবারে সংসার চালানোর মত অর্থ তাঁর ছিল না। কিন্তু চাকুরি পাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করলেন তিনি। মাইনেও বাড়লো। কলেজের প্রেম। সেই সার্বিয়ান

মেয়ে মিলেভা মারিক। এক সঙ্গে অঙ্ক কষতে কষতে, ইণ্টেলেক্চুয়াল গবেষণা করতে করতে ইণ্টেলেকচুয়াল প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। বিয়ের পর এক বৎসরের মধ্যেই তাদের একটি ছেলে হল। এবার সাংসারিক প্রেম। ছেলেটিরও নাম রাখা হল অ্যালবার্ট।

পারিবারিক জীবন আইনষ্টাইনের খুব প্রিয় ছিল বাল্যকালে। পিতা হয়ে তিনি সেই রকম জীবনের প্রতিষ্ঠা করে সুখী হলেন খুব। পেটেণ্ট অফিসের চাকুরী—সংসারের ফাঁকে ফাঁকে তার ক্রিয়াশীল প্রতিভার দীপ্তি—একটা বাড়ীর উপর তলার একখানা ঘর—সামান্য রান্না-বান্না, বাস্....ধর্মের গোঁড়ামি নেই; স্ত্রীটি আবার ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। বেশ যাচ্ছে ভাবী বৈজ্ঞানিকের প্রতিদিনগুলি। এর মধ্য দিয়েই তিনি জুরিখ ইউনিভার্সিটির পি, এচ, ডি ডিগ্রি লাভের জন্য থিসিস্ প্রস্তুত করে ফেলেছেন।

বার্ণের এই পারিবারিক দিনগুলিতে তার বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না। অধিকাংশই ইণ্টেলেকচুয়াল। বেশ আড্ডা জমতো তাঁদের নিয়ে। কিন্তু তফাৎ এই, এই আড্ডাতে অলোচিত হত ইণ্টেলেক্চুয়াল কথাই—বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রশ্ন।

নারীই নাকি পুরুষের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক—বিশেষ করে প্রতিভাবানদের পথে! তাদের মোহে পড়ে পুরুষ নাকি জ্ঞানচর্চার অবকাশ পায় না, সংসারের জালে আবদ্ধ হ'য়ে আর জ্ঞানের ঊর্ধ্ব আকাশে উড়তে সমর্থ হয় না, সময় নষ্ট করে এরা, পুত্র কন্যা এসে আরও ঝামেলা সৃষ্টি করে! অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরই এই মত। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের বেলায় কিন্তু সেরকম কিছু দেখা গেল না। শুধু স্ত্রী কেন, পুত্রও তার সংসারে এল; সংসারের মোহেও তিনি নিমগ্ন হলেন; তারপর সরকারী চাকুরি, অফিস করা, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সন্ধ্যায়

আবার আড্ডা এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়া....
এই রকম অবস্থায়ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার আইনষ্টাইনের মস্তিষ্কেই ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থাৎ থিয়োরী অফ্ রিলেটিভিটি প্রকাশ খুঁজছিল আইনষ্টাইনের মধ্য দিয়েই। সৃষ্টি আপনার পথ খুঁজে নেয় উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়ে। আইনষ্টাইনের মস্তিষ্ক-যন্ত্র এমনি ভাবে তৈরী ছিল যে, আপেক্ষিক বাদের এখানে উদ্ভব হওয়া ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। এই আবিষ্কারের জন্য আইনষ্টাইনের সাধনা করতে হয়নি। এ এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত ; প্রতিভার বিকাশও স্বতঃস্ফূর্ত, এই হল আসল কথা। যাকে দিয়ে যা হবে, তা হয়ই। সাধনারও হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলে চোখমুখ বুজে সাধনা করতে হবে, তার কি মানে আছে! অন্তত আইনষ্টাইনের মত লোকের তা প্রয়োজন ছিল না, তা দেখতে পাচ্ছি। প্রতিভা তাঁর পূর্বার্জিত। সহজ ভাবে এ বিকশিত হতে চেয়েছে তাঁর মধ্য দিয়ে। দেখা যায় কোনও প্রতিবন্ধকই প্রতিভাকে প্রতিহত করতে পারে না। এ যেন সাগরমুখী স্রোতস্বতীর মত সকল বাধা এড়িয়ে সাগরে গিয়ে পড়বেই।

আইনষ্টাইনের কথায়ই আসা যাক পুনরায়। বিয়ের সময় সময় তিনি Annalen der Physik পত্রিকায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে তখনকার বৈজ্ঞানিক জগৎকে সচকিত করে দেন। বিয়ে যখন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর ছেলে হয়। আর ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর থিয়োরি অফ্ রিলেটিভিটি—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আপেক্ষিক তত্ত্ব।

এই দুই তিন বৎসর তিনি অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। প্রত্যেকটিই মৌলিক। এই প্রবন্ধগুলিরই অন্যতম তাঁর আপেক্ষিকবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

কিন্তু এই রকম মৌলিক আবিষ্কারমূলক রচনা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কোনও বড় অধ্যাপকের চাকুরি তাঁর জুটল না। পেটেণ্ট অফিসে অল্প মাইনের এগজামিনারের কাজ করে তাঁর সংসার গুজরান চললো। যে সব মাল আসত পেটেণ্টের জন্য, সে সব বিচার করবার জন্য নিশ্চয়ই আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন হত না। অথচ এই নিয়েই তাঁর সময় ব্যয় ক'রতে হত। তাতে অবশ্য আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক মন ক্ষুণ্ণ হত না। আপন কাজ তিনি করে যেতেন সুশৃঙ্খল ও সার্থক ভাবে। পেটেণ্ট অফিসের কাজ ব্যহত হত না; কিন্তু পেটেণ্ট অফিসের নিয়মভঙ্গ হত কোন কোন ক্ষেত্রে। অফিসের কাজ অনেক সময় চটপট অথচ ভাল ভাবে সেরে নিয়ে তিনি হয়তো কয়েক মিনিটের জন্য কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসতেন গৃহীত বৈজ্ঞানিক মতের বিরুদ্ধে নিজস্ব পন্থায় কিছু লিখতে. শুনতেন না হয় তো ঠিক উপরের কর্মচারীটির কোনও মূল্যহীন নির্দেশ, মানতেন না হয় তো অন্য একজন সহযোগীর কোন পেটেণ্ট্ সম্বন্ধে ভুল ব্যাখ্যাকে। তা ছাড়া মিশতেও পারতেন না তিনি এই সব কেরাণী আর কর্মচারীদের সঙ্গে। অতএব অফিসে তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন না। তাছাড়া পাড়ায় তিনি পরিচিত ছিলেন সাধারণ মানুষ হিসাবেই। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—পাগলাটে মত দেখতে—অন্যমনস্ক ভাবে পথে চলে আর কি ভাবে এই লোকটা!

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। আইনষ্টাইনের বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর। এই সময় তিনি Annalen der Physik পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অফিসে একটা রচনা দিয়ে বল্লেন, 'দেখুন স্যার, আপনার কাগজে ছাপবার মত হয়ত, এই লেখা অনুগ্রহ করে ছাপবেন।' লেখাটা ছাপা হল; আর লেখাটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জগতে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল। এ শুধু

উচুদরের লেখা নয়, এ যে এত দিনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে অকাট্য যুক্তির সংঘাতে! পুরাতন ও আজ-পর্যন্ত-গৃহীত সমস্ত ধারণাকে যে বদলে দিচ্ছে এই অঙ্কের হিসাবগুলি! কার এই রচনা! কে এই আইনষ্টাইন! পদার্থ-বিজ্ঞানী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ মহলে এর ধাক্কা লাগল প্রথমে। জনসাধারণের ঔৎসুক্যের জাগরণ আরো কয়েক বৎসরের জন্য অপেক্ষা করছিল। বৈজ্ঞানিক মহলে আইনষ্টাইনের নাম হতে লাগল বটে, তার বিদ্রোহ-মূলক থিয়োরী অনেককে ভাবিয়েও তুললো; কিন্তু আইনষ্টাইনের দিন কাটতে লাগল সেই পেটেণ্ট অফিসে যাতায়াত করেই। ব্যক্তিটির খোঁজ আর কে করে! কিন্তু কত দিন! কত দিন অপরিজ্ঞাত থাকবে এত বড় বিদ্রোহ আর তার স্রষ্টা! দেশ, কাল, আলো, বস্তু, বিশ্বজগৎ—সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই এত দিনের বিজ্ঞানের ধাপে ধাপে গড়ে উঠা ধারণার মূলে এত বড় আঘাত যে হানলো, কত দিন আর সে ব্যস্ত থাকবে 'জুতা সেলায়ে'র কাজে!

Annalen der Physik-এ তাঁর ঐ মূল্যবান রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকলেও তাঁকে বছরের পর বছর ঐ পেটেণ্ট অফিসেই যাতায়াত করতে হত। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আর কত দিন লুক্কায়িত থাকবে! তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনা, বৈশিষ্টপূর্ণ যুগান্তকারী আদর্শ, যে আদর্শ সমস্ত পুরাতন পদার্থ-বিজ্ঞানের আদর্শের মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত হানছে, একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মাক্স্ প্লাঙ্কের দৃষ্টিতে তা এড়ালো না। কোয়াণ্টাম থিয়োরীর আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি তখন বিশ্ব-বিখ্যাত। অপরিজ্ঞাত প্যাটেণ্ট অফিসারের কর্মচারী আইনষ্টাইনকে চিঠি লিখলেন তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। আর একজন উদীয়মান বৈজ্ঞানিক মাক্স্ ফন্ লাওয়ে নিজেই গেলেন বার্ণে আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা

করে অভিনন্দন জানাতে। ক্রমশঃ প্লাঙ্ক আর লাওয়ের চেষ্টাতে বৈজ্ঞানিক বিদ্যোৎসাহী সমাজে আইনষ্টাইন পরিচিত হতে লাগলেন। দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিক মহল তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রতে লাগল। পেটেণ্ট অফিসের কর্মচারীর নিকট অযাচিত ভাবে কতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুরোধ আসতে লাগল অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করবার জন্য। আশ্চর্য, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এই রকম একটি আহ্বান এল তাঁর কাছে। কিন্তু আইনষ্টাইনের আগ্রহ দেখা গেল না অধ্যাপকের কাজ নেবার জন্য। তিনি জানিয়ে দিলেন, 'পেটেণ্ট অফিসের সীমাবদ্ধ জগতে বেশ আছি আমি; চাই না আমি সম্মান, গৌরব।'...কিন্তু আইনষ্টাইন নিজেই এবার আবিষ্কৃত। ইউনিভার্সিটির কর্তারা তাঁকে বহু পীড়াপীড়ি করাতে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে।

কিন্তু এক বারেই প্রফেসার হলেন না। ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুসারে তাঁকে কিছু দিন লেক্‌চারার হিসাবে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে তিনি পি এচ্ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। ডাঃ আইনষ্টাইন বলে তিনি এখন পরিচিত। আইনষ্টাইন ইউনিভারসিটির ক্লাসে প্রথম লেক্‌চার দিতে এসে দেখেন যে তাঁর লেক্‌চার শুনবার জন্য মাত্র দুটি ছাত্র এসেছে! তাঁর নাম যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি ভেবেছিলেন, কলেজের সমস্ত ছাত্র আর অধ্যাপক ভেঙ্গে পড়বে তার প্রথম বক্তৃতা শুনতে, হয়তো শহরের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা শ্রোতা হয়ে আসবেন। কিন্তু এ কী, মাত্র দু'জন! এরাও আবার তার পূর্ব পরিচিত বন্ধু—রেসো আর কাভাণ্ড্! এঁরা জানতেন আইনষ্টাইনের লজ্জাশীলতাও স্নায়বিক ভীরুতার পরিচয়। বেশী লোকের মধ্যে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়তো ঘাব্‌ড়ে যাবেন। তাই বন্ধু দুটি এসেছিলেন প্রথম বক্তৃতায় আবহাওয়াটাকে মসৃণ করে দিতে নেহাৎ বন্ধুত্বের খাতিরেই—সাহস দেওয়া চাই!

তারপর অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁর শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে লাগল। কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতার অভাব ঘটত সব সময়ই। এই জন্য পরে তিনি সুচিন্তিত ভাবে তাঁর বক্তৃতা তৈরী করে আনতেন না। কিন্তু এক দিন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে পড়ে গেলেন প্রফেসর ক্লাইনার—তার উর্ধ্বতন অধ্যাপক। আইনষ্টাইনের বক্তৃতা শুনে তো তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে গেলেন। কি বকছে ছাইপাশ! ভদ্রলোক গেলেন তাঁকে বুঝাতে যে ফাঁকি দিয়ে প্রফেসারী করা চলে না। তারপর উপদেশও দিলেন কি করে এবং কি ভাবে বক্তৃতা দিতে হয়। ফল দাঁড়ালো উল্টা। আইনষ্টাইন বল্লেন, 'দরকার নেই আমার এই রকম অধ্যাপনার; আমার পেটেন্ট অফিসই ভালো।' যাহোক, বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করা হল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর লেক্চারার থাকার পর তিনি প্রফেসার নিযুক্ত হলেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। জুরিখ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের বয়স এখন ৩০ বৎসর। বেশ ভালো মাইনে পান এখন। কিন্তু জীবনযাত্রার পারিপাট্য তাঁর নেই। শহরের একটি মধ্যবিত্ত পল্লীতে একটা বাড়ীতে তিনি ঘর ভাড়া করে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এই বাড়ীটার একাংশে তাঁর পুরাতন বন্ধু অ্যাডলেয়ারও বাস করছিলেন তখন। অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন। আর একটি নবাগত শিশুর আবির্ভাব হল এইখানে—তাঁর দ্বিতীয় পুত্র—নাম এডওয়ার্ড।

আইনষ্টাইনের ছিল না অর্থের মোহ, পদের মোহ ডিগ্রির মোহ। আভিজাত্যের আবহাওয়া তাঁর ভালো লাগত না। এই জন্য পদ ও আভিজাত্য-বিলাসী অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে তিনি মেলামেশা করতেন না। তাঁরাও চাইতেন না। তা ছাড়া অধ্যাপক হিসাবে এর বয়স বা কত; মাত্র ত্রিশ বৎসর। সেদিনও লোকটি পেটেন্ট অফিসে কাজ করতো! প্রৌঢ় বৃদ্ধ, ঝানু অধ্যাপকেরা একে নিজেদের সমপর্যায়ের মনে করতে

চাইতেন না। কতগুলি নামজাদা পদার্থ ও অঙ্কশাস্ত্রবিৎ ওকে প্রশংসা করে উঠিয়ে দিয়েছে বলেইতো, তা না হলে এমন কি মৌলিকত্ব বা বিশেষত্ব আছে এই অল্প বয়স্ক লোকটির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে—জুরিখ ইউনিভার্সিটির ঝানু অধ্যাপকেরা নিজেদের মধ্যে ঐ ভাবে বলাবলি করতেন।

কিন্তু এদের বক্তব্য যাই থাক, আইনষ্টাইনের খ্যাতি তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কত বিদ্বোৎসমাজ থেকে, কত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য, কত নূতন অধ্যাপকের পদে, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের জগৎ নিয়ে, চিন্তার জগৎ নিয়ে, জীবনাদর্শের জগৎ নিয়ে আইনষ্টাইন চলেছেন অনেকটা উদাসীন ভাবেই। তবু অনুরোধ তিনি এড়াতে পারতেন না। বাইরের বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন সাল্‌জুবুর্গের একটি বৈজ্ঞানিক সভায়। সেই সভায় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানান। তারপর তিনি হল্যাণ্ডের লেডেন ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার জন্য তাঁকে আহ্বান করেন হল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত পদার্থবিৎ লরেন্‌ৎস্। কিছুদিন পরে লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। ঠিক এই সময় প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁর কাছে আহ্বান আসে অনুরূপ কাজ নেবার অনুরোধ জানিয়ে।

এবার দুটি কারণে তিনি অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সংসার তার বড় হয়েছে। ছেলেদের লেখাপড়া শিখানো চাই; গবেষণার কাজের জন্যও তার নিজস্বভাবে কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকা দরকার। প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বেতন দেওয়া হবে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় বেতনের চেয়ে তার পরিমাণ অনেক বেশী। প্রাগে গবেষণার

অবসর তার বেশী মিলবে, আশা করা যায়। সুবিধাও সেখানে অনেক।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যায়ের আবহাওয়া তাঁর ভালো লাগতো না। এই কাজ তিনি ছেড়ে দিতেনই। তবে মনের দিক থেকে তার ঝোঁক ছিল লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। সেখানে অধ্যাপক লরেন্‌ৎস্‌ আছেন। আইনষ্টাইনের প্রিয় এই খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গ তিনি সেখানে পেতেন। কিন্তু অন্যান্য প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াতে তিনি প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করাই সমুচিত মনে করলেন।

প্রাগে আসবার এক বৎসর পরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'জেনারেল থিয়োরী অফ্‌ রিলেটিভেটি'র প্রাথমিক সূত্রগুলি প্রকাশ করেন। এরই ভিত্তির উপর তিনি পরবর্তী কালে তার এই থিয়োরীকে সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 'রিলেটিভিটি থিয়োরী'র আর একটি অংশ তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেই আবিষ্কার করে সে তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়।

প্রাগের আবহাওয়ায় আর্থিক অসাচ্ছল্য ও চিন্তার অবকাশের বিস্তর সময় থাকার দরুন আইনষ্টাইন তাঁর রিলেটিভিটি থিয়োরী নিয়ে ব্যাপক ভাবে গবেষণা করতে থাকতেন। এই সময় তাকে খুব বেশী খাটতে হত। তিনি নিজেই বলেছেন, 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমাকে অবিমিশ্র ভাবে খাটতে হয়েছে।' তাঁর চিন্তাধারাও গবেষণা এ সময় কতবার তাঁকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সত্য হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। তার এই সমস্যা সমাধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা যেন তাঁকে ভূতের মত পেয়ে বসত। তার জীবনযাত্রার সহজ পথে একদিন যে ধারণাগুলি আপনি থেকে বিকশিত হয়েছ, এবার সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যুক্তি দিয়ে, নিখুঁত হিসাব দিয়ে। এই জন্য চাই অফুরন্ত কাজ, নিরন্তর

কাজ। এবার সত্যি সত্যি তিনি সাংসারিক জীবনের সাথে সব সময় খাপ খাইয়ে চলতে পাচ্ছেন না। খাওয়াদাওয়ার কথা ভুলে যান, ভুলে যান ছেলেদের কথা, স্ত্রীকেও চুমো দিতে যান ভুলে। তা বলে সংসারের প্রতি তাঁর ভালবাসা একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁকে এদিকটা স্মরণ করিয়ে দিতে চান, হেসে রাজী হন তিনি। কিন্তু তাঁর মনের আকাশে সুশৃঙ্খলভাবে বীজগণিতের অক্ষরগুলি দুলতে থাকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আরও বিস্তৃত হয়ে প্রকাশ পায়; ব্রহ্মাণ্ডের পুরাতন রূপই বদলে যায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে। এজগতে আইনষ্টাইন আজ একা। পুরাতন কোনও বৈজ্ঞানিকের সমর্থন নেই, নিউটনের অবধারিত জগৎ, যে জগতের উপর সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও ফলিত পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তারই ভিত্তি টলায়মান আইনষ্টাইনের ধারণার সংঘাতে। তাকে বিদ্রোহ করতে হচ্ছে সমস্ত গৃহীত পদার্থ বিজ্ঞানের আদর্শের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহে তিনি একাকীই সৈনিক। আর কেউতো এ ভাবে ভাবেন না, এই ভাবে চিন্তা করেন না!

ইতিমধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া গড়ে উঠতে থাকাতে সর্বত্রই কেমন একটা ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। সমস্ত ইয়োরোপ যেন যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। ছোটকাল থেকেই আইনষ্টাইন ছিলেন সামরিক জীবনের বিরোধী। ইহুদী রক্ত তার মধ্যে ছিল বলে তীব্র স্বাদেশিকতার বিরোধী তিনি ছিলেন। যে দেশকে ভাল লাগতো, সেই দেশেই তিনি ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন। জার্মান হয়েও তাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক জীবন। এই আন্তর্জাতিক ও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব নিয়ে. তিনি প্রাগে থাকাকালীন অবস্থায় তার সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন যুদ্ধ-বিরোধীদের প্রতি। চেক্‌দের মধ্যে তাঁর বন্ধুবান্ধব জুটলো। ঐ দেশের বোহেমিয়ানরা যুদ্ধের সমর্থক। শুধু চেক্

অধিবাসীরা যুদ্ধ চায় না। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বোধ—এই সব কারণেই অনেকটা তাকে প্রাগ্ ছাড়তে হল।

এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফিরে এলেন জুরিখে—সেই কনফিডারেট পলিটেকনিক অ্যাকাডেমিতে, যেখানে তিনি প্রথম ভরতি হ'তে এসেছিলেন ষোল বছর আগে, লাজুক ভীরু দরিদ্র বালকটি। অন্যতম প্রধান অধ্যাপক ও পরিচালক হিসাবে কাজ নিয়ে এলেন। এবার কিন্তু তাঁর শ্রোতা দুজন নয়। তার বক্তৃতা শুনবার জন্য বহু ছাত্র অধ্যাপক ও বাইরের লোক জুটে যেতে লাগল। এখানে তাঁর কাজের চাপ ছিল খুব বেশী। তবু তিনি অবসর করে নিতেন তাঁর অঙ্কশাস্ত্রীয় গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার জন্য। এবার তাঁর কাজের সহায়তা করতে লাগলেন পুরাতন বন্ধু মার্শেল গ্রসমান, অনেক ভারী ভারী অঙ্ক তিনিই কষে দিয়ে আইনষ্টাইনের সময়ের চাপের লাঘব করেদিতেন।

তখনও তাঁর থিয়োরীগুলি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখাত নয়, তখনও তাঁর মত সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হয়নি। বস্তুত আইনষ্টাইন নিজেই তখনও তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে পারেননি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইনষ্টাইনের অধ্যাপকের জীবন কাটলো ক্লাসে বক্তৃতা দিয়ে। অনেক সময় এতেই কেটে যেত। তা ছাড়া এতদিন ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েও তিনি ভাল বক্তা হ'তে পারেননি। ভালো ক'রে গুছিয়ে কিছু ব'লতে তাঁর অসুবিধা হত। জনতার সামনে কেমনতর একটা ভয় তাঁর এখনও জাগে। এতে সময়ও যায়, মেজাজও খারাপ হয়। গবেষণা করবার জন্য যদি নিরবচ্ছিন্ন সময় পাওয়া যেত, এই সব গোলমেলে ক্লাসগুলি যদি না করতে হ'ত!

ভাগ্য ভাল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকটাতেই তাঁর এই রকম সুযোগ জুটলো।

তিনি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মাকস্ প্লাঙ্কের প্রচেষ্টায় প্রাশিয়ার 'অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স' বা বিজ্ঞান পরিষদে একটি অধ্যাপকের পদ পেলেন। অধ্যাপক উহফ্-এর মৃত্যুতে এই পদটি খালি হয়।

এই বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিব্‌নিৎস্‌এর প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য প্রাশিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডারিকের আনুকূল্যেও অর্থ সাহায্যে এই পরিষদকে কার্যকরী ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই পরিষদের সভ্য যারা, তাঁরা সবাই জার্মানীর নামকরা বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্র, এই চারিটি বিভাগে এই পরিষদ বিভক্ত। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭০ জন; তবে এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, এরূপ আরও দুশত জন সদস্য আছে। সাধারণত বার্লিন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকরাই এর স্থায়ী সদস্য। এই সব অধ্যাপকরা অধ্যাপনার চেয়ে গবেষণার কাজেই নিজেদের বেশী নিয়োজিত রাখতেন। এই পরিষদেও গবেষণায় উপর জোর দেওয়া হত। সাধারণত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এই পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিদ্বানদের সুযোগ দেওয়া হত এই পরিষদে যোগদান করবার। মাক্স্ প্লাঙ্কের প্রচেষ্টায় আইনষ্টাইন এই সুযোগটি পেয়ে তৃপ্ত হন। এখানে শুধু গবেষণারই কাজ। ছেলে পড়াতে হবে না, বক্তৃতা দিতে হবে না। অবশ্য তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ইচ্ছা হবে তখন বক্তৃতা দিবেন। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। তাকে অবশ্য কোন দিন ঐরূপ বক্তৃতা দিতে হয়নি। তিনি বার্লিনে শুধু বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য-অধ্যাপক ছিলেন না, এখানকার 'কাইজার উইল্‌হেল্‌ম ইন্‌ষ্টিউট্ অফ্ থিয়োরিটিকাল ফিজিক্স'-এর ডাইরেক্টারও নিযুক্ত হলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম

এই বিজ্ঞান মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে।

এই সময় আইনষ্টাইনের বয়স ৩৪ বৎসর। বার্লিনের অধ্যাপকগণ তাঁকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে লাগলেন। এখন তিনি তাঁর সময়কে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত ক'রতে পারছেন গবেষণার কাজে। সুযোগ. সুবিধা ও সহানুভূতির মাঝে এই তরুণ বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন ; যদিও, এই সময় বিবাহরূপ আর একটি ঘটনা তাঁর জীবনে আবার ঘটলো। নূতন ভাবে বৈজ্ঞানিক জীবনে আরম্ভ করবার আগে নূতন একটি স্ত্রীর আবির্ভাব আইনষ্টাইনের জীবনকে বরঞ্চ আরও মসৃণ করে দিল। যেমন দিয়েছিল তাঁর প্রথম স্ত্রী।

বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন অবশ্য প্রথম স্ত্রী ও দ্বিতীয় স্ত্রী—দুটিকেই নিয়ে ঘর করবার বিশেষ আইনগত অধিকার পাননি। দ্বিতীয় বিবাহটি তিনি করলেন প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ক'রে। প্রথম স্ত্রী, সেই শ্লাভ্ মেয়েটির সাথে শেষের দিকে বিশেষ বনছিল না তাঁর। দুটি ছেলে হওয়া সত্ত্বেও এই না-বনার প্রধান কারণ শেষের দিকে আইনষ্টাইনের গবেষণার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক বলে মনে করা যেতে পারে, যদিও পরিবারিক অন্যান্য কারণও ছিল। প্রতিভাবানদের স্ত্রী বাধা হয় না ; প্রতিভাই স্ত্রীদের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তাও অনেকটা দেখা গেল আইনষ্টাইনের প্রথম পত্নীর জীবনে।

আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম এলসা। বহুদিনের চেনা এই মেয়েটি আইনষ্টাইনের বাবার এক সম্পর্কীয় ভাইয়ের মেয়ে। প্রথম প্রেমের একটা রোমান্টিক যোগ আইনষ্টাইনের ছিল এর সাথে।

বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এতদিন পরে দেখা হল এই বার্লিন শহরেই। এলসারও এখন বয়স হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার বিবাহও

হয়েছিল। কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয়নি। ফলে এ ক্ষেত্রেও হয় বিবাহবিচ্ছেদ। পুরাতন স্ত্রী ও পুরাতন স্বামীর অধিকার-বিমুক্ত হয়ে পুনর্বিবাহিত হলেন এঁরা। এই নূতন মিলন অবিচ্ছেদ্য হয়ে রইল।

আইনষ্টাইনের প্রথম স্ত্রী ছিলেন কলেজে পড়া মেয়ে—স্ত্রীর অধিকার জ্ঞান-সম্পন্না। তাঁর প্রেম ছিল বেশীর ভাগ মস্তিষ্কঘটিত। আর বর্তমান মিসেস আইনষ্টাইন হলেন কিছুটা পুরাতনপন্থী। এঁর প্রেমটা হৃদয়ঘটিত। স্বামী সেবাটা ইনি নিয়েছিলেন স্বাভাবিক কর্তব্য বলে। আইনষ্টাইনের মত আত্মভোলা লোকের পক্ষে এই সেবাটাই ছিল বিশেষ দরকার। তাঁর প্রতিদিনের সুবিধা-অসুবিধাগুলি দেখবার জন্য মায়ের মত, বোনের মত, একটি স্ত্রীর দরকার ছিল। এলসা সে অভাব মিটিয়েছিলেন ভালো ভাবেই। অনেক দিন এই স্ত্রী নিয়ে আইনষ্টাইনের প্রতিদিনের জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছিল ; কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে এখন বার্ধক্য জীবনের মুখে এসে তিনি সত্যই অসুবিধায় পড়ে গেলেন।

বার্লিনে প্রায় বিশ বছর কাটিয়েছেন তিনি। একই ফ্ল্যাটে, একই বাড়ীতে এই বিশ বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটিয়ে দেন, যদিও অন্যান্য ব্যাপারে তার সুনির্দিষ্ট অভিমত তিনি ব্যক্ত করে এসেছেন সময় সময়। তাঁর আন্তর্জাতিকতা, তাঁর শান্তিবাদ, তাঁর যুদ্ধ-বিরোধিতার আদর্শ কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কখনও তিনি তাঁর এই মতের দৃঢ়তার জন্য কারও কাছে নতি স্বীকার করেননি।

এই বিশ বছর বার্লিনের জীবনযাত্রার রূপ তাঁর সরল ও বাহুল্য-বর্জিত মনেরই পরিচয় দেয়। একটা ছোট্ট স্কোয়ারের সামনে অন্যান্য বাড়ীর সাথে ঘেষা নিজেদের বাড়ীটার উপরতলার অংশে থাকতেন আইনষ্টাইন। আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না তাঁর ঘরে, ছিল না মূল্যবান

বস্তুর সমারোহ। শুধু তাঁর লাইব্রেরী ঘরটার জন্য পয়সা খরচ করতেন বাধাহীন ভাবে—ঘর সাজাবার জন্য নয়, বই কিনবার জন্য। তাঁর শোবার ঘরটিতে বেশী আসবাব ছিল না। এই ঘরে টাঙানো দুইখানি বড় বড় ফটো ছিল উল্লেখযোগ্য। একটা ছিল বৃহৎ পারিবারিক ফটো আর একখানা কুকুরসহ ফ্রেডারিক দি গ্রেটের বড় ছবি; আর এই ঘরে এক কোণে ছিল একটি পিয়ানো।

তার পড়াশুনার ঘরখানাও ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। টেবিলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ম্যাগাজিন ও প্যাম্ফলেট ইত্যাদি—মাঝে মাঝে সিগারেটের ছাই। আইনষ্টাইনের ছবিতে তাঁর মুখে পাইপ নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন। পাইপটা ছিল তাঁর অপরিহার্য—অর্থাৎ তামাকটা অথবা তামাকের ধোঁয়াটা। একটা তাকে সাজানো ছিল কতগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আর ম্যাগাজিন, ডেস্কের উপর নিউটনের প্রতিকৃতি; এবং আশ্চর্য, এই ঘরে একটা পিয়ানোও সজ্জিত দেখতে পাওয়া যেত। কয়েকটা বেতের চেয়ার আর আসবাবের মধ্যে বিশৃঙ্খল চেহারায় এই ঘরটার মধ্যে বসে খুব সুশৃঙ্খল ভাবে আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণার কাজ করে যেতেন। মাঝে মাঝে কাজের প্রাচুর্যের মধ্যে উঠে তিনি পিয়ানোতে বাজাতেন বাক্, বিঠোফোনের সুর।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কোথায়? তার টেবিলে একটা ছোট দুরবীন দেখা যেত। একদিন, যারা দেখা করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এইটাই কি সেই দূরবীন, যার সাহায্যে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন বিশ্বজগতের বিপুল রহস্য দূরে তারার দিকে চেয়ে চেয়ে?'

আইনষ্টাইন হেসে বল্লেন, 'তারার দিকে চেয়ে থাকার কাজ আমার নয়; এই যে দুরবীনটি দেখছেন, এটার মালিক একজন মুদি; সে আগে

এখানেই থাকতো। আমি দুরবীনটাকে রেখেছি খেলার জিনিস হিসাবে।'

'কিন্তু আপনার যন্ত্রপাতি কোথায়?'—জিজ্ঞেস করলেন উৎসুক ভদ্রলোক।

আইনষ্টাইন নিজের মাথায় টোকা দিয়ে হেসে বল্লেন, 'এই আমার যাকিছু যন্ত্রপাতি।'

সকাল বেলায় আটটায় উঠে তিনি দাড়ী কামাতেন এবং স্নান করতেন। তার জলের যোগাড় করতেন স্ত্রী নিজে—ঠাণ্ডা জল গরম জল, যখন যা দরকার। তিনি দাড়ী কামানোর আর স্নান করবার সময় একই সাবান ব্যবহার করতেন। সেভিং সোপ বলে কিছু ছিল না তাঁর। এর পর প্রাতরাশ সেরে সেই পাইপটি মুখে দিয়ে তিনি আসতেন পড়ার ঘরে। এবার বসতেন ফাউণ্টেন পেন আর এক প্যাড্ কাগজ নিয়ে গভীর গবেষণায়। কাজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে আইনষ্টাইন বলতেন, 'আমি চার ঘণ্টার বেশী কাজ করতে পারি না।' কিন্তু আসলে তিনি সব সময়েই কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি নিজেই বলতেন, কাজ করা মানে চিন্তা করা। পরিষদের, ইউনিভার্সিটির ও তার স্টাডি ঘরের কাজের বাইরেও তিনি উঠতে ফিরতে সব সময় চিন্তা করতেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে, দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে কখনও কখনও। অন্যমনস্ক অধ্যাপক বলতে যা বুঝায়, আসলে তাই ছিলেন তিনি। চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন থেকে দৈনন্দিন কত ছোটখাটো কাজে তিনি হাস্যকর ভুল করে ফেলতেন।

তাঁর বার্লিনে আসার সময় থেকে সমস্ত ইয়োরোপ মহাযুদ্ধে সংলিপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। আইনষ্টাইন এই যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কার্যকরী ভাবে এর বিরুদ্ধ আন্দোলন চালানোর সময়ও মনোভাব তাঁর ছিল

না। যুদ্ধের এই কোলাহলের মধ্যে তাঁর নির্জন ঘরে তিনি যখন একা থাকতেন, তখন তাঁর সাথে যে জগতের যোগাযোগ থাকতো, সেখানে যুদ্ধের কোলাহল পৌছত না, পৌছত না দৈনন্দিন জীবনের ছোঁয়া ; সে জগতের সঙ্গে এতদিনের বৈজ্ঞানিক ভাবেও স্বীকার্য জগতের কোনও মিল থাকতো না। শুধু ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জগৎ কেন, জগৎ সম্বন্ধে যত কিছু জ্ঞানগত ধারণা এতদিন বর্তমান ছিল, সেই ধারণার জগৎও তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে থাকতো না······

তবু প্রতিদিনের জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পোষণ করিতেন, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তা সমর্থনীয় নয় কিন্তু কাইজার উয়িলিয়াম রাষ্ট্রের মত বিজ্ঞানকেও দিতেন বৃহৎ সম্মান। তাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের রাজনৈতিক বা নৈতিক মতামতকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই দিনগুলিতে আপনার স্টাডি ঘরে বসে তিনি ভুলে যেতেন বাইরের জগতকে, এই সময় তিনি তাঁর জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির পূর্ণতা সাধন করেন। বিকিরণ সম্বন্ধেও তিনি এই সময় নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। বস্তু-স্বরূপ সম্বন্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ সার্থক গবেষণা করেন এই সময়।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইন তাঁর জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেন। তিনি তার থিয়োরী বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে। এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা এ পর্যন্ত হয়নি, যুক্তির প্রখরতা ও সারবস্তুর জন্য বৈজ্ঞানিক মহলে তা স্বীকৃত হয়েছিল। এবার আইনষ্টাইন ঘোষণা করলেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করা সম্ভবপর। পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় গৃহিত ফটোগ্রাফ তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।

ইয়োরোপে যখন মহাযুদ্ধ চলছিল, প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ক'রে দেখবার

মত আবহাওয়া তখন ছিল না। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ এল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি স্থাপনের পরে এবং এই পরীক্ষার ভার নিলেন এতদিনকার জার্মানীর শত্রু দেশের—ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কাল। ইকোয়াটরের কাছাকাছি একটা দুর্গম জায়গা থেকে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখা যাবে। জায়গাটা হলো পূর্ব ব্রেজিলের মধ্যে। নির্বাচিত স্থানটির নাম সব্রাল (Sobral) কয়েকজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এখানে সূর্যগ্রহণ পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক টন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি খাটিয়ে ফেলেন। আর একটি ইংরেজ বৈজ্ঞানিক দলও এই পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁদের যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত থাকেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী—একটি ক্ষুদ্র পর্তুগীজ দ্বীপ—গিনিয়া উপসাগরের অন্তর্বর্তী প্রিনসিপে (Principe) দ্বীপে।

২৯শে মে, সকাল বেলা। উপরোক্ত দুটো জায়গাই অক্ষরেখার থেকে একশো মাইলের মধ্যে। সে বৎসর এরকম জায়গা থেকেই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা সম্ভবপর ছিল।

আইনষ্টাইন তখনও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকরা তাঁর থিয়োরীর কথা জানতেন বলেই সেবার সূর্যগ্রহণের মধ্য দিয়ে আইনষ্টাইনের কথার সত্যতার প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলেন। আইনষ্টাইন আগেই বলেছিলেন, 'আগামী সূর্যগ্রহণ যখন হবে তখন লক্ষ্য করবেন তারার আলো সূর্যের পাশ দিয়ে চলবার সময় কি ব্যবহারটা ক'রে ; তা হ'লেই বুঝতে পারবেন আমার অনুমানের সত্যতা কত খানি·· ·· '

তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে (General Theory of Relativity) বর্ণিত হয়েছে যে, বস্তুর উপস্থিতিতে নিকটবর্তী সকল দেশে একটা বক্রতার সৃষ্টি হয়। এই বক্রতার পরিমাণ নির্ভর করে

একটা তারার মাধ্যাকর্ষণের শক্তির ক্ষেত্র অনুযায়ী। বস্তুর পরিমাণ ও বিস্তৃতির উপর এই বক্রতা নির্ভরশীল। এই বক্রতা ঘটে ব'লে আকাশের তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সব চলমান বস্তু-পিণ্ডগুলির গতিবেগে তার প্রভাব পড়ে। এরা তখন বক্র পথই অবলম্বন ক'রে চলে।

এখন দেখা যাক ইংরাজ বৈজ্ঞানিকরা কি করেন। কথাটা যদি সত্য হয়, সূর্যগ্রহণের সময় তা পরীক্ষামূলক ভাবে বুঝতে পারা যাবে। সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়া তারার আলো নিশ্চয় তা হলে সূর্যের সান্নিধ্যে দূরে সরে যাবে, নয়তো এর মাধ্যাকর্ষণে কাছে আসবে। তা ছাড়া দেশ যদি বেঁকে যায়, তা হ'লে জ্যামিতিক ভাবেও এই পরিণতি ঘটিবে। এই দূর তারকার আলোরশ্মি ঠিক কতটা বিচ্যুত হবে, আইনষ্টাইন তা পর্যন্ত হিসাব করে রেখেছিলেন অঙ্ক কষে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সুযোগ না পেলে এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সম্ভবপর হত না। কেন না, সূর্যের যা চোখ ঝলসানো আলোক! চাঁদ দিয়ে আবরিত না হলে এ আলোর তীব্রতার জন্য নক্ষত্রেব অবস্থিতি পৃথিবীর মানুষেব দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এই জন্যই সূর্যগ্রহণের সুযোগ নেওয়া। গ্রহণের সময় সূর্য ঢাকা পড়লেই নক্ষত্রগুলি বেশ জ্বল জ্বল করে পর্যবেক্ষকদের দূরবীনের সামনে ফুটে উঠবে। অমনি তাঁরা নিয়ে নিবেন নক্ষত্রের ফটো। এখন এই সময় তোলা একটি নক্ষত্রের ফটোগ্রাফের সাথে অন্য সাধারণ সময়ে তোলা এই নক্ষত্রের ফটোগ্রাফের সাথে তুলনা ক'রে দেখা হবে। সাধারণ সময়ের ফটো অবশ্য তুলতে হবে তখন, যখন সূর্য আকাশের অন্যত্র অবস্থিত থাকবে। এখন দুই ফটোগ্রাফের মধ্যে তুলনা করে দেখতে হবে, নক্ষত্রের জন্য কোন রকম ব্যতিক্রম ঘটেছে কি না! কিন্তু নক্ষত্রটি তো সূর্য থেকে কোটী কোটী আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত। অতএব ঐ নক্ষত্রপিণ্ডটিতো সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে

পড়তে পারে না। এখন কোন একটি সময়ে যদি সূর্য ও নক্ষত্র উভয়েই মানুষের একই দৃষ্টি-রেখায় পড়ে, তাতে করে নিশ্চয় নক্ষত্রের দূরের অবস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটছে বলে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তা অনুমান করা যাবে না। তবে আইনষ্টাইন যে বলেছেন, তাঁর থিয়োরী অনুসারে বক্রতায়ও পরিবর্তন ঘটে! তা বুঝতে পারা যাবে কি করে, যদি কথাটা সত্যই হয়? হাঁ, তা বুঝতে পারা যাবে যদি উপরোক্ত দুই অবস্থায় তোলা নক্ষত্রের ফটোগ্রাফের মধ্যে তুলনা করা যায়। পরিবর্তন যদি ঘটেই তা হলে ঘটবে দুই অবস্থায় নক্ষত্রালোকের দুই রকম ব্যবহারের জন্য। সূর্যগ্রহণের সময় যদি নক্ষত্রালোক আমাদের দিকে আসতে গিয়ে সূর্যের কাছাকাছি এসে বেঁকে যায় তা হলে নক্ষত্রের ছবিও একটু আলাদা রকমের হবে। নক্ষত্রালোক যদি সামান্যও অন্তর্মুখী বেঁকে যায়, তা হলে নক্ষত্র যে সূর্য থেকে দূরে সরে আসছে, তা বুঝতে পারা যাবে। নক্ষত্র যে দৃশ্যতঃ স্থানচ্যুত হয়েছে, তা ফটো থেকেই প্রতিভাত হবে।

২৯শে মের আকাশে পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টির সামনে মাঝে মাঝে মেঘ উড়ে আসছিল। গ্রহণের সময় এই মেঘগুলি মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করছিল বটে, কিন্তু ফাঁক পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। ঐ ফাঁকের সুযোগ নিয়ে নানা কোণ থেকে জ্যোতির্বিদ বৈজ্ঞানিকগণ চটপট করে অনেকগুলি সুস্পষ্ট ফটো তুলে ফেললেন। ফটো তোলা হল ব্রেজিলের দুর্গমতায় আর আফ্রিকার দ্বীপে। বৈজ্ঞানিকরা লণ্ডনে ফিরে এলেন। এখানে নক্ষত্রের অন্য ফটোগ্রাফের সাথ নূতন ফটোগ্রাফের তুলনা করা হল। উৎসুক বৈজ্ঞানিক ও বিস্মিত জগতের সামনে আইনষ্টাইনের অনুমান পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হল। প্রমাণিত হল, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে নক্ষত্রালোকের বক্রতা প্রাপ্তি ঘটেছে।

এর কয়েক বৎসরের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে আর একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে তিনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে একেবারে ভেঙ্গেচুরে ফেললেন।

আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক পরিণতি ও আবিষ্কারের কথা আমরা অন্য অধ্যায়ে বলব। এখন বলব ব্যক্তিটিকে নিয়ে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত। আইনষ্টাইন নিজেই বলেছেন, তাঁর থিয়োরী বুঝবার মত মাত্র বারোটি লোক আছে বর্তমান তুনিয়ায়। তাই বলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল লোকে শুধু তাঁকে জানতেন, তা নয়; সাধারণ জনতা শুনেছে তিনি এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, 'তুটো সরল রেখা এক জায়গায় মিলে', 'একটা লোক যদি আলোর গতিবেগে অগ্রসর হইতে পারে, তবে আর তার বয়স বাড়বে না', 'মাধ্যাকর্ষণ হয় দেশের মধ্যে সঙ্কোচন সৃষ্টি হওয়ার ফলে', 'একটা মাপ-কাঠির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এর গতিমুখের দিকের উপর', 'সময় হল চতুর্থ পরিমাপক', 'বস্তু মানে শক্তি'। এমন সব তিনি প্রমাণ করেছেন যে, নিউটন, গ্যালিলিও, ইউক্লিড সবারই মত বাতিল হয়ে গেছে। আর আসলে জগৎটাই সব relative—সবই আপেক্ষিক ব্যাপার।

অবশ্য ঐরকম কথাগুলিও অত বড় খ্যাতি সৃষ্টি করবার মত একটা কিছু নয়। কিন্তু বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা সবাই বলে আইনষ্টাইন নাকি তুমুল কাণ্ড করেছেন পদার্থজগতে! অতএব তাঁর বাড়ীতে ও বাড়ীর সামনে নানা ধরনের লোকের ভীড় হতে লাগল। বৈজ্ঞানিকরা তো আসতে লাগলেনই, আসতে লাগলেন সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট, দার্শনিক রাজনৈতিক আদর্শবাদীর দল। আসতে লাগলেন ছাত্র, সম্পাদক, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের দল। তা ছাড়া আসতে লাগলো নানা পদের মেয়েও। কেউ

আসে অটোগ্রাফ নিতে, কেউ আসে এই রকম একটা মাথাওয়ালা লোকের কাছ থেকে তার প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে উপদেশ পেতে। ফিল্ম কোম্পানীর মালিক আসে তাঁর ফিল্মের ছবি তুলতে। অবশ্য সবায় সাথে দেখা করবার সময় তিনি ক'রে উঠতে পারেন না; তবু মাঝে মাঝে দুই একটি উৎসাহী লোকের আগ্রহের মূল্য তিনি দেন বই কি। দুই একজন বৈজ্ঞানিকও আসেন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করতে। আইনষ্টাইন অবশ্য জানতেন, জনতার কাছে তাঁর এই খ্যাতি নেহাতই সাময়িক। সূর্যগ্রহণের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল নিয়ে যখন কাগজে কাগজে তাঁর প্রশংসা হল, তখন তাঁর তত্ত্ব সম্বন্ধে জনতা না বুঝলেও তাঁর আবিষ্কারের অদ্ভূতত্ব সম্বন্ধে সবাই উৎসাহী হয়ে উঠল। জনতার উৎসাহ সম্বন্ধে একদিন তিনি গোপনে তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'এই রকম ভাব বেশী দিন থাকবে না, থাকতে পারে না, ওদের সাময়িক ভাবে মাথা খারাপ হ'য়েছে, কালই সব ভুলে যাবে।'

একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার এই যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পর আইনষ্টাইন যখন জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝবার জন্য হাজার হাজার বই আর প্যাম্ফ্লেট প্রকাশিত হতে লাগল। সাধারণ পাঠকদের বুঝানোর জন্য দশ বছরের মধ্যে ঐ রকম পাঁচ হাজার বই বেরিয়েছে। এই সব বইয়ের প্রায় সবগুলির লেখকই জানেন না আপেক্ষিক তত্ত্বের খাঁটি বৈজ্ঞানিক ও আঙ্কিক প্রকৃতিকে।

কিন্তু এই আপেক্ষিক তত্ত্বের এমন একটা দার্শনিক ব্যাখ্যার দিক আছে, তা সহজেই বুঝানো চলে। অনেক উদাহরণ দিয়ে তাঁর জগতের একটা সুন্দর ছবি আঁকা চলে। এ জগতের রূপ সত্যি আশ্চর্য ও সম্পূর্ণ আলাদা রকমের।

তিনি যেন একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে

অবতারণা করেছেন একটি যুগেরও। আইনষ্টাইনের তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠল যে নব্য দর্শন ও ভাবধারা, এযুগের মানুষের সমগ্র জীবনে তার বিপুল প্রভাব বিস্তার হল ; সমগ্র ভাবে মানুষের চিন্তাধারার রূপ গেল বদলে।

খ্যাতির এই মধ্যাহ্ন দিনে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আইনষ্টাইনের বয়স হল ৪০ বৎসর। যৌবনোত্তীর্ণ দিন। অবশ্য যৌবনটা কোনো দিনই প্রবল ভাবে দেখা দেয়নি তাঁর জীবনে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বৈজ্ঞানিক আইন-ষ্টাইনের সাথে এই চল্লিশ বছর বয়সের আইনষ্টাইনের মূলত পার্থক্য ছিল না। সেদিনও তিনি ছিলেন চিন্তামগ্ন উদাসীন, আপনভোলা বৈজ্ঞানিক, আজও তিনি তাই। সেদিনও তিনি মাথায় টুপি দিতেন না, আজও দেন না। সেদিনের গোঁফজোরা অত বড় না হলেও বাড়বার ঝোঁক দেখাতো খুব ; সেদিনও তাঁর মাথার চুল ছিল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া— আজও তাই। আইনষ্টাইন কিন্তু লোকটি বেটে চেহারার। পরে একটু বেশ মোটাসোটাও হয়েছিলেন ; থলথলে ভাব। ভালো পোশাক পরবার দিকে তাঁর কোন দিনই লক্ষ্য ছিল না ; হাতের কাছে যা পেতেন, তাই পরে নিতেন। মিসেস আইনষ্টাইনকে তাঁর স্বামীকে সামলাতে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হত। বাড়ীতে তিনি সাধারণতঃ ঢিলাঢালা ট্রাউজার পরতেন আর গায়ে দিতেন সোয়েটার—বাস্! অনেক সময় তিনি বড় বড় নিমন্ত্রণেও যেতেন সাদাসিধা পোশাক পরে। অস্লোর এক বিরাট বিজ্ঞান সভায় তিনি পুরাপুরি স্যুট না পরেই বাহাল তবিয়তে বক্তৃতা দিয়ে যেতে থাকেন। সবারই চোখে পড়ছে তাঁর পোশাকের অসম্পূর্ণতার দিকে। বৈজ্ঞানিকের সে দিকে একটুও খেয়াল নেই। পরে যখন খেয়াল হল, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমার কোটটা যদি ত্রাস করা মনে না হয়, তবে আমি কোটের গায়ে একটা নোটিশ টাঙিয়ে

পারি ; তাতে লেখা থাকবে এই মাত্র ব্রাস করা হয়েছে।' এই কথা বলবার আগে তিনি সবাইকে দেখিয়ে তাঁর কোর্টটি হাত দিয়ে ঝেড়ে নিয়েছিলেন।

পাইপ কিন্তু তাঁর ঠোঁটে লাগাই থাকতো, সে ষ্টাডি-ঘরই হোক বা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার রাস্তায় হোক।

বড় বড় সোসাইটি, উৎসবাদিতে তিনি যেতে চাইতেন না। ওসব তাঁর খুব হাস্যকর মনে হত। পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাহুল্য দেখিয়ে ওরা সবাই কি আনন্দ পায় সে .ওরাই জানে! নমস্কার, প্রতিনমস্কার বা ভদ্রসমাজের কায়দা-কানুনে তিনি বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন না। এই জন্য তিনি না বুঝে অনেককে ক্ষুণ্ণ করেছেন।

এইরূপ কোন দুর্ঘটনার কথা জ্ঞাত হলে তিনি লোকটির পিঠ চাপড়িয়ে বলতেন, 'ভাই ওটা কিছু নয়, ফর্মালিটি জিনিসটা অভিনয় বইতো নয়!' কথাবার্তায় তিনি ছিলেন ভয়ানক খোলা ; কারো মুখ রেখে কথা বলবার লোক তিনি ছিলেন না।

কোন একটা জায়গায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয় এই বলে যে, সেখানে কয়েক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব মিলে রাত্রির আহার করবেন মাত্র। কিন্তু আইনষ্টাইন গিয়ে দেখেন চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ব্যাপার আর বিরাট বহুজনোচিত আয়োজন! আর যাঁরা এসেছিলেন, সব সমাজের চাঁই চাঁই লোক—টাকার কুমির সব। এঁরা সব ঘনিষ্ঠ বন্ধু! দুত্তর ছাই! তিনি ঘরে ঢুকেও পিছ পা হলেন। দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গিয়ে আর ওমুখো হলেন না।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তার পক্ষে এই পুরস্কার পাওয়া অস্বাভাবিকও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হলো ১০০০০ পাউণ্ড। তখনকার হিসাবে দেড় লক্ষ

টাকার উপর। পুরস্কারটি পেয়ে কিন্তু তিনি পকেটস্থ করলেন না। একটি মাত্র পেনি রেখে বাকী সব টাকাটাই তিনি দান করে দিলেন। চারদিক থেকে কত সম্মানসূচক ডিগ্রী, ডিপ্লোমা মেডাল আসতে লাগল তাঁর জন্য। বিনম্রভাবে সেগুলি তিনি গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর উৎসাহিত হবার কিছু ছিল না।

তবে ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির দেওয়া একটি মেডাল পেয়ে তিনি সত্যই খুব খুসী হয়েছিলেন। এই রয়াল সোসাইটিই তাঁর তত্ত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যগ্রহণের পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বৈজ্ঞানিক দল পাঠিয়ে।

নিজের খ্যাতি সম্বন্ধও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। লোকে একটু উৎসাহিত হয়েছে, তিনি তা দেখতে পেয়েছেন ; কিন্তু তা মনে রাখবার মত কিছু নয়। তাঁর খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীনতার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে ঃ

বেলজিয়মের রানীর নিমন্ত্রণে একবার তিনি ব্রশেলস্ শহরে ট্রেন হতে অবতরণ করেন। তাঁর খেয়ালই হয়নি যে তাঁকে অভিনন্দিত করে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন ফিটফাট পোশাকপরা রাজকর্মচারী উপস্থিত আছেন স্টেশনে। এক হাতে স্যুটকেস আর এক হাতে বেহালা নিয়ে তিনি তো হেঁটেই চললেন রানীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীর দিকে। এ দিকে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা দেখতে পেলেন না এমন একটি লোককে —যাকে হোমরাচোমরা কেউকেটা মনে হতে পারে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল স্যুটকেশ হাতে বেটে লোকটি রানীর নিমন্ত্রিত অতিথি হতে পারে, সেতো এদের কল্পনায়ও আসেনি। এঁরা সব বাধ্য হয়ে রানীকে খবর দিলেন যে আইনষ্টাইন নিশ্চয় আসা সম্বন্ধে মত বদলেছেন, কই তাঁকে তো গাড়ী থেকে নামতে দেখা গেল না !

ঠিক এই সময়ে রানী দেখলেন ধূলায় মলিন পোশাক পরা এক ব্যক্তি হেঁটে আসছে এই দিকে। কাছে আসতে তিনি চিনতে পারলেন, এ যে আইনষ্টাইন নিজে!

কাছে আসতেই রানী বললেন, 'আমি যে আপনার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছিলাম, ডাঃ আইনষ্টাইন!'

'তাই না কি', মৃদু হেসে বল্লেন আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক, 'আমার জন্য গাড়ী যাবে ও কথা আমার মনেই হয়নি ; গাড়ী থেকে নেবেই আমি চলে এলাম, হাঁটতে কিন্তু বেশ লাগল!'

টাকাপয়সার দিকে তাঁর কোন রকমই আকর্ষণ ছিল না। কত লোকে তাঁকে তাঁর লেখার জন্য, প্রশংসাপত্রের জন্য, তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করেছে বহু টাকার বিনিময়ে। টুথ পেষ্ট, দাড়ী কামানোর সাবান, সিগারেট, এই সবের জন্য প্রশংসা করে কিছু লিখে দিলেই অনেক ব্যবসায়ী তাকে টাকা দেবার জন্য উৎসুক হয়েছিল ; কিন্তু তিনি এই সব প্রলোভনে কর্ণপাত করতেন না। তবু টাকা তাঁর আসত নানা ভাবে। এক সময় তিনি বার্লিনে ১৫০টা পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। তাঁর একটা মূল্যবান বক্তৃতা পুনর্প্রকাশের জন্য একটি জার্মান সাময়িক পত্রের সম্পাদক অনুরোধ জানান। এর জন্য ১০০০মার্ক দাম তিনি দেবেন বলেন। আইনষ্টাইন প্রথমটায় এই অনুমতি দেননি ; কিন্তু সম্পাদক তাকে বল্লেন, বিজ্ঞানেব দিকে কর্তব্যের দিক থেকেও তাঁর এই রচনাটি পুনর্মুদ্রনের অনুমতি দেওয়া উচিত। এবার আইনষ্টাইন রাজী হলেন। কিন্তু তিনি বল্লেন, 'ঐ রচনার জন্য ১০০০ মার্ক দাম খুব বেশী, যদি সম্পাদক এর দাম ৬০০ মার্ক নিতে রাজী হন, তবে তিনি ছাপবার অনুমতি দিতে পারেন।'

জার্মান সম্পাদক আইনষ্টাইনের লেখাটি ছাপতে পেরেছে দেখে

একটি আমেরিকান কাগজের সম্পাদক আইনষ্টাইনকে জানান যে, তিনি তাকে কয়েক সহস্র ডলার দিতে রাজী আছেন, যদি আইনষ্টাইন অনুগ্রহ করে তাকে একটি রচনা দেন যে কোন বিষয় লিখে। এতে আইনষ্টাইনের চোখে জল আসে। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, 'এতো রীতিমত অপমান, লোকটি কি ভাবে যে আমি একজন সিনেমার ষ্টার না প্রাইজ নিয়ে লড়ি!'

তিনি তো লেখা দেনইনি, এমন কি লোকটির অনুরোধেরও কোন উত্তর দেননি।

তিনি কখনো ট্যাক্সিতে উঠতেন না। সবাই যাবেন বাসে বা হেঁটে, তিনি যাবেন ট্যাক্সিতে, না তা কেমন করে হতে পারে, তারা তো তারই মত মানুষ! পথেঘাটে চলতে তিনি থার্ড ক্লাসেই যাওয়া পছন্দ করতেন। তবে স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে ভালোমত যাবার জন্য সেকেণ্ড্ ক্লাসে চড়তে বাধ্য হতেন।

অঙ্কশাস্ত্রের যাদুকর এই বৈজ্ঞানিক কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসাব বা সংসারের খরচের হিসাবপত্র রাখতে পারতেন না। স্ত্রীই রাখতেন এসব।

আইনষ্টাইন কিন্তু তাঁর সঙ্গীত চর্চা কোনদিন ভোলেননি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তো বেহালা বাজাতেনই, তা ছাড়া প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতের আসর বসত।

দর্শন ও সাহিত্যের দিকে তার বরাবরই ঝোঁক ছিল। শ্রেষ্ঠ লোকেদের রচনা তিনি পড়তেন। তাঁর প্রিয় দার্শনিকরা হলেন প্ল্যাটো, হিউম, স্পিনোজা, শোপেনহাওয়ের। সাহিত্যিকদের মধ্যে তার প্রিয় ছিলেন টলষ্টয়, ডষ্টয়েভেস্কী আনাতোল ফ্রাঁস, বার্ণাড শ। কবিদের মধ্যে তার প্রিয় কবি ছিলেন, গেটে হাউপ্টমান্ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রদর্শনেও তিনি বিমুগ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবে দুজনে এক সঙ্গে ফটোও তুলেছেন। সুরশিল্পীদের মধ্যে তার প্রিয় ছিলেন মোজার্ট, বিটোফেন, বাক্।

ছেলেদের সঙ্গ খুব প্রিয় এই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের। ছেলেদের মধ্যে তিনি ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন। তারপর তিনি অনেক মৌলিক গবেষণা করলেও, তার অধিকাংশই আপেক্ষিক তত্ত্বকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর যা দেবার দেওয়া হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠার চরম সীমায় তিনি উঠেছেন। কিন্তু তবু তার মস্তিষ্ক ও মন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। নানা ভাবে তারা বিকাশ খোঁজে। এতদিন তিনি নিজেকে জ্ঞানরাজ্যই ব্যাপৃত রেখেছেন, ব্যাপৃত থাকতেই চেয়েছিলেন তিনি। রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত থাকলেও তিনি তার আবহাওয়া এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানীতে তিনি আর নিজেকে এই আবহাওয়ার বাইরে রাখতে পারলেন না। বিশেষ করে ১৯২০।২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জার্মানীতে যে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল, তাদের মধ্যে, বিশেষ করে, হিটলারের ন্যাশনাল সোশিয়ালিষ্ট পার্টি তাদের অন্যতম কার্যক্রম হিসাবে ইহুদীদের প্রতি বিষোদ্গার আরম্ভ করে দিল। ১৯২৭।২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠেছিল, জার্মানীর ইহুদী অধিবাসীরা খুব আশঙ্কান্বিত হয়ে পড়েছিল। নাৎসি আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য এই যে, জার্মানীর পতনের জন্য ইহুদীরাই সর্বপ্রথম দায়ী! তারাই অর্থের জন্য জার্মানীকে বিক্রি করেছে মিত্র শক্তির হাতে। আন্তর্জাতিকতা, শান্তিবাদ, কম্যুনিজম—এই সমস্তেরই প্রবর্তক ও প্রচারক হল এই আন্তর্জাতিক ইহুদীদের দল। এমন কি ইহুদী মনীষার বিজ্ঞান

ও চিন্তার ক্ষেত্রে বৃহৎ দান থাকলেও সেই বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা জাতীয়তার পরপন্থী। জার্মানীকে বাঁচতে হলে চাই সর্ব প্রথম ইহুদীদের ধ্বংসসাধন। জার্মানীর বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্যগুলি ইহুদীদের হাতে; এমন কি জার্মান কালচার ও বিজ্ঞানও ইহুদীদের করতলগত। অতএব বিদুরিত কর তাদের! এই সব প্রচারের ফলে সমগ্র জার্মানীতে ইহুদীবিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে পড়ল, অঙ্কুরিত হল, গাছ হয়ে দাঁড়াল।

আইনষ্টাইন নিজে ইহুদী। নাৎসিদের এই প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা জেগে উঠা স্বভাবিক।

জার্মানীর পতনের জন্য ইহুদীরা দায়ী কি না এ প্রশ্ন না মানলেও একথা সত্য যে, অধিকাংশ ইহুদীই আন্তর্জাতিকতাবাদী ও শান্তিবাদী; কোন দেশের উপরই তাদের অন্তরের টান নেই। বালক আইনষ্টাইন নিজেই জার্মান জাতীয়তা পরিত্যাগ করে সুইজ জাতীয়তা গ্রহণ করেছিলেন। ইহুদী না হলেও বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর মত আন্তর্জাতিকতা ও শান্তিবাদের পক্ষপাতী হতেন। ইহুদীকুলে জন্মগ্রহণ করাতে তিনি যেন রক্তের দিক থেকেই শান্তির পথ ও আন্তর্জাতিকতার পথ, বিশ্বমানবতার পথ বেছে নেন।

উগ্র নাৎসি জাতিয়তাবাদের দৃষ্টিতে আইনষ্টাইনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শ। নাৎসিদের আত্যান্তিক স্বাদেশিকতার আদর্শ এমনি রূপ ধারণ করেছিল যে, তারা উচ্চতর মনীষা ও কালচারকে অপমানিত করে আনন্দ পেত। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কোন দেশীয় গণ্ডি না থাকাই উচিত। কিন্তু হিটলার প্রভুত্ব পাওয়ার পর জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ যাতে নোবেল প্রাইজ বা বৈদেশিক কোন প্রাইজ গ্রহণ না করেন, সেইরূপ নির্দেশ দেন। নাৎসিদের মতে জার্মানীতে থাকবে শুধু জার্মান বিজ্ঞান, জার্মানীতে থাকবে শুধু জার্মান সংস্কৃতি।

বলা বাহুল্য আইনষ্টাইনের মত বৈজ্ঞানিক ও আদর্শবাদী লোকের কাছে এই ধরনের মত কোন মতেই স্বীকার্য হতে পারে না।

বালক বয়স থেকেই তিনি জার্মান আদর্শবাদকে ও জার্মান স্বাদেশিকতাকে অস্বীকার করে এসেছেন। আবার তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে তার মুখোমুখী হলেন। এখন আর বিজ্ঞানের মণিকোঠায় নিজেকে বন্দী রাখলে চলবে না। চাই এর সুস্পষ্ট ও তীব্র প্রতিবাদ। আইনষ্টাইন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অনেকটা মুখ্য ভাবেই রাজনীতি গ্রহণ করলেন। নাৎসিদের আদর্শও তাদের ইহুদী বিদ্বেষের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করলেন নানা রচনায় ও বক্তৃতায়। তা ছাড়া তিনি প্রচার করিতে লাগলেন তাঁর স্বকীয় আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা ও শান্তিবাদের আদর্শ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক একজন ইহুদী বলে নাৎসিরা ব্যক্তিগত-ভাবে আইনষ্টাইনকেও অপমান করতে লাগল তাদের প্রচারের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে আইনষ্টাইন যখন নিজেই তাদের মতবাদের বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন, তখন তো কথাই নেই। সমস্ত শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করে নাৎসি কাগজগুলিতে আইনষ্টাইনের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত গালিগালাজ সুরু হল।

আইনষ্টাইন ইহুদীবাদ বা Judaism এর স্বপক্ষে ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি যে ইহুদী তা আমি প্রথম আবিষ্কার করি সাধারণ লোকদের কাছ থেকে।' কিন্তু এই আবিষ্কারের পর তিনি জুদাইজমের বিশেষ পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। সত্যিইতো এরা বিদ্বেষ প্রচার করে বলে ইহুদীজাতি হীন হবে কেন! তিনি গর্ব অনুভব করতে লাগলেন তাঁর জাতির জন্য। তিনি বল্লেন, 'শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানর্চায় মনোনিবেশ করেছে ইহুদীরা, সুবিচারও ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি ইহুদীদের একটি প্রবল আন্তরিক ভালবাসা ইহুদী জাতির

ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত; আমার জন্ম নক্ষত্রকে ধন্যবাদ যে আমার ইহুদীকুলে জন্ম!'

তিনি লিখলেন, 'যারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী, যারা চায় আত্মাকে ধ্বংস করে তাকে রাষ্ট্রের ক্রীতদাস করতে পশুবলের সাহায্যে, তারাই ঠিক দেখে আমাদের মধ্যে তাদের সব চেয়ে বড় ও অদমনীয় শত্রুকে....'

জাতীয়তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী তিনি। 'নেশন' কথাটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। 'ইহুদীরাওতো এক হিসাবে জাতি', এই রকম একটা মন্তব্য কোন সমালোচক দেওয়াতে তিনি বলেছিলেন, 'এই কথার কিছু সত্যতা থাকতে পারে; এই বিরুদ্ধ জগতে বেঁচে আমরা থাকতে পারি না, মরে যেতেও পারি না, যদি না আমাদের একটা সম্প্রদায়গত উদ্দেশ্য থাকে; এই উদ্দেশ্যটাকে ঐ কুৎসিৎ নামে সর্বদাই অভিহিত করা চলে বটে। আমাদের যদি অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণচিত্ত হিংসাপ্রিয় লোকদেয় মধ্যে বেঁচে থাকতে না হত, তা'হলে আমিই সর্ব প্রথম সমস্ত জাতীয়তা-বাদকে দূরে নিক্ষেপ করতাম আর তার পরিবর্তে চাইতাম বিশ্বমানবতাকে।'

আইনষ্টাইনের আদর্শবাদ কেন্দ্রীভূত হল 'জুদাইজম'-এর মধ্যে। ইতিমধ্যে ডাঃ ওয়ালটার রাথেনাওয়ের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত জার্মান সরবরাহের ভার মূলতঃ এঁর হাতেই ছিল। জার্মান সৈন্যদের সমরোপকরণ ও খাদ্যসংগ্রহ ব্যবসায় সংক্রান্ত ঐদিকটা এঁর দ্বারা পরিচালিত হত। কোটীপতি এই ব্যক্তিটির সাথে আইনষ্টাইন রাজনৈতিক কারণেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে লাগলেন। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অনেকটা সমাজতান্ত্রিকতার রূপ নেয়। তিনিও বিশ্বমানবতা ও ডেমোক্রেসীর প্রতি আগ্রহ দেখাতে

থাকেন। আইনষ্টাইন রাথেনাওকে আন্তর্জাতিক ইহুদী নেতা কায়িম ভাইসমানের সাথে পরিচিত করে দেন। এঁদের এই যোগাযোগ নাৎসিদের দৃষ্টিতে সত্যিই মারাত্মক। এই সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক প্রভাবও তো কম নয়! তখন হিটলারিজমের সূচনার যুগ। তাই হিটলার-পন্থীরা গোপনে চিঠি পাঠাতে লাগলেন এঁদের কাছে হত্যার ভয় দেখিয়ে। আইনষ্টাইন যে কত চিঠি পেয়েছেন তার অন্ত নেই। সময়টা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় জার্মানীর রাইখ চ্যান্সেলর ছিলেন ভির্থ। তিনি তাঁর উদারনৈতিক গভর্ণমেণ্টে রাথেনাওকে পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে গ্রহণ করেন।

ঐ বৎসরই ২৪ শে জুন রাথেনাও নিহত হন গুপ্ত ষড়যন্ত্র-কারীদের হাতে।

বন্ধুর এই গুপ্ত হত্যার সংবাদে আইনষ্টাইন খুবই মর্মাহত হন। গুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীদের ব্ল্যাক্ লিষ্টে আইনষ্টাইনেরও নাম ছিল। তাই তিনি বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে কিছু দিনের জন্য হল্যাণ্ড চলে যান।

কিছু দিন পরে অবশ্য তিনি জার্মানিতে ফিরে আসেন। জার্মানিতে যাতে শান্তি ফিরে আসে, তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। জার্মান চ্যান্সেলার ষ্ট্রেসমানের সঙ্গে তিনি এই সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা করেন।

প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী কালে শান্তির বার্তা নিয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসাবে তিনি যান জার্মানীর শত্রুদেশগুলিতে মুখ্যত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিতে। কিন্তু এই যাত্রার মধ্যে তাঁর শান্তিদৌত্যের বাসনাই ছিল প্রধান। যে বিজ্ঞানের বাণী তিনি শুনাতে যাচ্ছেন, সেই বিজ্ঞানই কি আন্তর্জাতিকতার সুস্পষ্ট আদর্শ বহন করে না? বিজ্ঞানের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতে থাকেন শিল্পের কথা, সঙ্গীতের কথা,

মনীষীদের দানের কথা, যে দান কোন জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়।

লীগ অফ্ নেশন্‌সের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচারের পথ কিছুটা উন্মুখ হয়েছে দেখে তিনি খুবই সুখী হন। লীগ 'কমিশন ফর ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন্' বলে একটি কমিশন সৃষ্টি করে। এতে বিভিন্ন দেশের মনীষীদের যোগ দেবার কথা। আইনষ্টাইন জার্মানির পক্ষ থেকে যোগদান করেন। তিনি এতে নিয়মিত ভাবে যোগ দিতে থাকেন। এই কমিশনের প্রথম বৈঠক বসে জেনেভায়। সভাপতি হন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গশোঁ। হল্যাণ্ড থেকে প্রতিনিধি হয়ে আসেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লরেনৎস্—আইনষ্টাইনের বহুকালের বন্ধু। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা দুজনেই ঐ কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঐ বৎসর লরেন্‌ৎসের মৃত্যু হওয়ায় এবং আইনষ্টাইনের হৃদয়-যন্ত্র সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ায়—দুজনেই চিরতরে কমিশনের কাছ থেকে বিদায় নেন।

রাজনৈতিক কারণে আইনষ্টাইনের অনেক শত্রু হয়েছিল। একদিন একজন রাশিয়ান মহিলা—মাদাম মারী এরগুয়েসেওয়া প্যারিসবাসী একজন আমেরিকানের বিধবা পত্নী—আইনষ্টাইনকে হত্যার উদ্দেশ্যে গোপনে তাঁর ঘরে যায়। আইনষ্টাইনের পত্নীর সতর্কতায় এই রমণীটি ধরা পড়ে যাওয়ায় বিপদ কাটে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হতেই আইনষ্টাইন একটু খোলাখুলি ভাবে রাজনীতির পথে নামতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ রাজনীতিও তাঁর জীবনের একটা প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য বিজ্ঞান তখনও তাঁর প্রধান সহচর। বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক বক্তৃতাই তিনি দেশ বিদেশে দিতে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে মিশিয়ে দেন তাঁর আন্তর্জাতিকতা ও শান্তিবাদকে। ১৯২৫। ২৬

খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজনীতির দিকেই আইনষ্টাইন বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। এখন থেকে তাঁর প্রধান বক্তব্য বিষয় হয় আন্তর্জাতিকতা, শান্তিবাদ, বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ ও 'জুদাইজম'। আগে তিনি নির্জনতাই পছন্দ করতেন, লোকের ভীড় এড়িয়ে চলতেন; কিন্তু এখন তিনি তাঁর আদর্শ প্রচারের প্রয়োজনে সবার সঙ্গে মিশতে লাগলেন। রাজা, সম্রাট থেকে সুরু করে সাধারণ লোক—সবার সঙ্গে তিনি সামাজিক যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেন। প্রচারকাজের জন্য তিনি ইওরোপ, আমেরিকার প্রায় সব দেশই পরিভ্রমণ করেন। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টাগুলি অনেকটা ব্যক্তিগত। তিনি কোন পার্টি বা দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন না, যদিও বহু কনফারেন্স, সভা ইত্যাদিতে যোগদান করতেন। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, বলেছেন আমেরিকান নিগ্রোদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। চীনে জাপানীদের আক্রমণের তিনি প্রতিবাদ করেছেন, যোগদান করেছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সভায়। ডেমোক্রেসী ও সাম্যবাদমূলক জাতীয় সংগ্রাম, তা যেখানেই সংঘটিত হোক না কেন, তাঁর সমর্থন পেয়েছে। তিনি বলেছেন পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তিনি। বিশ্বমানবতাই তাঁর আদর্শের বড় কথা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। সাহিত্য, কলা, ধর্ম, আত্মার অমরত্ব, বৃদ্ধ বয়সের পেনসনাদি, যান্ত্রিক যুগ, আণবিক যুগ, এমন কি পারিবারিক সমস্যার সম্বন্ধেও তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছেন সুস্পষ্ট ভাবে লেখায়, বক্তৃতায় বা আলোচনায়।

হাসি ঠাট্টা তিনি ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে বেশ রসিকতাও করতেন। অনেক চিঠিপত্র আসতো এবং বহু লোক আসতো বলে

আইনষ্টাইন একটি তরুণী সেক্রেটারী রেখেছিলেন এই ব্যাপারে ভার নেবার জন্য। বৈজ্ঞানিকের সাথে দেখা করতে হলে প্রথমত সেক্রেটারীর সাথে আগন্তুকদের ব্যবস্থা করতে হতো। সেক্রেটারী কথাবার্তা বলে অনেককেই বিদায় দিয়ে দিতো। এরা তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করত। এদের অনেকেই বলতো, 'দু'এক কথায় রিলেটিভিটি থিয়োরিটা বুঝিয়ে দিন।' মেয়েটি অতবড় বিষয় তাদেরকে দুই একটি কথায় বুঝাবে কি করে, আর কতটু বা সে জানে! আইনষ্টাইনকে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'বলুনত, দু'এক কথায় রিলেটিভিটি থিয়োরীটা প্রশ্নকারীদের বুঝাই কি করে?'

আইনষ্টাইন বল্লেন, 'তাইতো!' তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'লেন। মেয়েটি লক্ষ্য করলে না যে বৈজ্ঞানিকের ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন, 'তাঁদের বলগে যে, যখন একজন পুরুষ কোন সুন্দরী মেয়ের পাশে ঘণ্টাখানেক বসে থাকে, তখন তার মনে হয় মাত্র এক মিনিট সে বসেছে, কিন্তু তাকে যদি একটা গরম উনানের সামনে এক মিনিট বসতে দাও, তার মনে হবে, এক মিনিটতো নয়, যেন এক ঘণ্টা সে বসেছে ঐইখানে—এই হলো রিলেটিভিটি।'

একজন আমেরিকান পত্রলেখক জানতে চান, মাধ্যাকর্ষণ ও প্রেমে পড়ার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না। এই প্রসঙ্গে লেখক জানান যে, তিনি মনে করেন প্রেমে পড়াটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। আইনষ্টাইন সংক্ষিপ্ত কথার যে উত্তরটি দেন তা হ'ল এই: 'প্রেমে পড়াটা নিশ্চয় বোকামির কাজ নয়, এবং তার জন্য মাধ্যাকর্ষণকে দায়ী করা যেতে পারে না।'

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর জীবনের রাজনৈতিক ও আদর্শের দিকটা ব্যাপকতা লাভ করায় তিনি ইওরোপের প্রায় সব দেশেই তাঁর বাণী প্রচার করতে থাকেন। বিজ্ঞানের প্রয়োজনেও তাঁকে এইরূপ ভ্রমণ করতে হত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আহ্বান আসে জাপান থেকে। নূতন জায়গা ও নূতন লোকের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারলেন না। এই সর্ব প্রথম তিনি ইওরোপের বাইরে যান। একটি জাপানী জাহাজে তিনি সস্ত্রীক রওনা হন। এই যাত্রার ডায়েরী তিনি রেখেছিলেন প্রথম থেকেই। তাতে তাঁর হাস্যরসিক ও অনুভূতিপূর্ণ মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্সেলেইতে তিনি যে প্রাতরাশ করেন, তার সম্বন্ধে ডায়েরীতে লেখেন, 'প্রাতরাশটা ভালই হ'লো, তবে কফিতে কয়েকটা পোকা ছিল মাত্র।'

ষ্টীমারে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে হঠাৎ তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পান না। এই সম্বন্ধে লিখেছেন, 'স্ত্রীকে সিঁড়ির পথে হারিয়ে ফেলেছি, তবে তার ভাগ্যি এই মুহূর্ত্তেই তাকে পাওয়া গেল।'

জাপানী মাঝীমাল্লাদের ব্যবহার দেখে তিনি লিখেছেন, 'এদের বেশ একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আছে, বেশ একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখে এরা, এই জন্য এরা যে-কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।'

তাঁদের জাহাজ কলোম্বার তীরে ভিড়েছিল। তখন তিনি শহরটি ঘুরে আসেন। শহর, বাজার সিনামন গাছের বাগান আর এখানকার অধিবাসীদের চেহারার বিশেষত্ব তাঁকে বেশ মুগ্ধ করে। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর একটা বড় ধারণা চিরকাল ছিল। এখানে তিনি এই জাতির কিছুটা পরিচয় পান। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, 'এদের চেহারা ও চলাফেরার মধ্যে কেমন একটা আভিজাত্যের

গর্ব মেশানো ; অথচ, তবু কেমন একটা নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ পায় এদের চেহারায় ও ব্যবহারে ; যেন আসলেই এরা অভিজাত ; কিন্তু পরিণত হয়েছে ভিক্ষুকে।'

সাংঘাইতে পৌঁছে চীনবাসীদের দেখে মন তাঁর বেদনায় ভরে ওঠে। তিনি লিখেন, 'পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার গর্ব করতে পারে যে দেশ, সে দেশের অধিবাসীরা আজ মৃতপ্রায়, শোষিত, অনাহারক্লিষ্ট ; এরা যেন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পরিবর্তনহীন, নিথর !'

এই চীনের কয়েকটি বন্দরে তিনি অবতরণ করেন। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বত্র সাদর অভিনন্দন জানায়। বিদ্যোৎসাহী জনসভায় ও জনতার সামনে তিনি বক্তৃতা দেন জার্মান ভাষায়। তাঁর ভাষা অনেকেই নিশ্চয় বোঝেনি ; কিন্তু তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যে অব্যক্ত বাণীর প্রকাশ হয়, তারই স্পন্দন লাগে আজকের সুপ্ত চীনের বিপুল সংস্কৃতির গভীরতার।

জাপানের কোবে বন্দরে গিয়ে যখন তাঁদের জাহাজ পৌঁছল, তখন তিনি দেখতে পান কি বিপুল অভিনন্দের আয়োজন! মনীষীকে চিরকাল আন্তরিকতার সাথে শ্রদ্ধা করতে জানে প্রাচ্যের অধিবাসীরা ; ভক্তিতে তারা বিগলিত হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের 'শো' এ নয়, এ হ'লো প্রাচ্যসুলভ মনের অভিব্যক্তি।

মনীষী, তাই তাঁর এত সম্মান। বিদেশের কোন সম্রাট বা সভাপতিকে এই ভাবে গ্রহণ করতো না জাপানের অধিবাসীরা। সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানের বার্তাবাহক নবযুগের ব্যক্তিত্বের প্রতিই তারা সম্মান জানিয়েছে।

অবতরণের পর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অতিথি হন আইনষ্টাইন দম্পতি। সমস্ত জাপানের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখানোর জন্যে সুবন্দোবস্ত হয় তাঁদের জন্যে। যেখানে যান সেখানেই তাঁরা অভিনন্দিত হন। কত লোকে যে কত

উপহার দিয়েছে তাঁদের! কত ছেলে মেয়েদের যে আদর করে গাল টিপে দিয়েছেন আইনষ্টাইন! বক্তৃতা দিয়েছেন বিদ্যায়তনে, বিজ্ঞানসভায়, জনতার মধ্যে; চা খেয়েছেন, আহার করেছেন কত লোকের বাড়ী। জাপানে এসে জনতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রাচ্যজাতির মাঝখানে এসে প্রাচ্যদেশকে আরো ভালবাসতে শিখলেন তিনি।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা বার্লিনে ফিরে আসেন। প্রাচ্যের গর্বিত আভিজাত্য, প্রাচ্যের সকরুণ দারিদ্র্য ও প্রাচ্যের অন্তরের ভালবাসা, প্রাচ্যের দাসত্ব দুঃখ, হতাশা ও অধঃপতন—সবই তাঁর মনের মধ্যে প্রবল নাড়া দেয়। ইওরোপে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর রচনায় ও বক্তৃতায় যে বাণী প্রচারিত হতে থাকে, তা সমগ্র জাতির মুক্তির বাণী, সমগ্র লোকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার, স্বাচ্ছন্দ্যের, শোষণ-বিমুক্ততার আদর্শে অনুপ্রাণিত। আইনষ্টাইনের আন্তর্জাতিক মনে ব্যবধানের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়।

বৈজ্ঞানিক তিনি। প্রাচ্যদেশের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি প্রশ্ন করেন,—এযুগের এই বিপুল বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূল্য কি, যদি তা প্রাচ্যের থেমেযাওয়া জীবনপ্রবাহে প্রচণ্ড আলোড়ন না দেয়! ঐহিক জীবন যাত্রায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, স্বাস্থ্যে সম্পদে প্রাচ্যের অধিবাসীরাও সার্থক হয়ে উঠতে পারে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের সাহায্যে। সমগ্র ভাবে বিজ্ঞানের কেন অপব্যবহার হবে, যুদ্ধে, বিগ্রহে, শোষণে?

কর্মব্যস্ততায় ও আদর্শের অভিব্যক্তির মাঝখানে তিনি তাঁর বিজ্ঞানকে ভুলে যাননি। নির্জন অবসরে তাঁর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় বিজ্ঞান রাজ্যে। তাঁর ষ্টাডি-রুমে কাগজকলম নিয়ে তিনি বসেন মাধ্যাকর্ষণ ও দেশকাল নিয়ে নূতন সমস্যার সমাধান করতে। আসলে তাঁর জগৎ বিজ্ঞানের জগৎ। চিন্তালোকেরই অধিবাসী তিনি। তবু তিনি নেমে

আসেন পৃথিবীর টানে। সেখানে তাঁর যোগ রয়েছে অন্তরের। তবু কাজ কাজ; বাইরের কাজ তাঁর অনেক। তাঁর খ্যাতি তাঁকে কাজের পথে টেনে আনে; তাঁর বিজ্ঞানই তাঁকে বাধ্য করে নানা দেশ থেকে প্রাপ্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে—বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাইরের কাজে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারি ডিগ্রি গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করে। তিনি তা গ্রহণ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকায় কতগুলি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেবার জন্য পরিভ্রমণ করতে হয়। কিছুদিন পর তিনি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসিল রোড্‌স্‌ মেমোরিয়াল লেকচারারের পদগ্রহণ করেন। এই সময় একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান একটি অর্থভাণ্ডার খুলে আইনষ্টাইনের গবেষণার কাজে সাহায্য করবার জন্য খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ডাঃ ওয়ালথার ম্যাথারকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন।

•

আইনষ্টাইন যে খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন তা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু এই বাজানো কেবল সৌখিন ব্যাপার ছিল না তাঁর কাছে। এ ছিল তাঁর শিল্পী-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মনের আর একটা দিক। সুরের মধ্যে, সঙ্গীতের মধ্যে তিনি পেতেন মুক্তি, পেতেন অবসর, পেতেন ক্লান্তির অবসান। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গীত ছিল বিজড়িত। শিশুকাল হতে তিনি ভালোবেসে এসেছেন তাঁর বেহালাকে। চিরকাল রয়েছে এই বেহালা তাঁর সঙ্গী....আর বেহালাটা তিনি একটু-আধটু বাজাতে পারতেন না, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। অধিকাংশ সময় তিনি একা একা বাজাতেন বেহালা তাঁর স্টাডি-রুমে, কখনো কখনো বা রান্নাঘরেও। অরকেষ্ট্রার মধ্যে কনসার্টে যোগ দিয়েও সুর বাজাতেন মাঝে মাঝে ওস্তাদী সুর-শিল্পীর মতই

তাঁর বেহালা বাজানো সম্বন্ধে সুন্দর একটি কাহিনী আছে। জার্মানীর একটা ছোট্ট গ্রামে সঙ্গীতের আসর বসেছে। আইনষ্টাইন হলেন এই আসরে সম্মানিত অতিথি। এ সভায় উপস্থিত একজন সঙ্গীত-রিপোর্টার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ ঝাঁকড়া চুল-ওয়ালা মোটাসোটা ব্যক্তিটি কে, যার হাতে বেহালা দেখা যাচ্ছে?' উত্তর পেল, 'কেন, জানেন না, এ যে বিশ্ব-বিখ্যাত আইনষ্টাইন!'

আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি সম্বন্ধে রিপোর্টারটির কোন ধারণা ছিল না। তবে হঁা আইনষ্টাইন নামটা শুনেছে বলে মনে হচ্ছে। বাস্, বসে গেল সে হাত গুটিয়ে টাইপ-রাইটার নিয়ে। এ সভার স্বর ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেকখানি লিখল সে—আইনষ্টাইন সম্বন্ধে লিখলে, 'ইনি যা বেহালা বাজিয়েছেন, সে আর কি আর বলব! সঙ্গীতের ইতিহাসে এ হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। এযুগের শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত অন্যান্য বেহালাবাদকরা যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন আজ, তাঁদের প্রতিভা ম্লান হয়ে যেত এই সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক আইনষ্টাইনের কাছে।'

কাগজে যখন এই রিপোর্ট বের হল, তখন আইনষ্টাইন আর হাসি চেপে রাখতে পারেন না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক তিনি! নানা ভাবে তার প্রশংসা করে কত লেখাইতো বেরিয়েছে। ঐ সব কাটিং তিনি রাখতেন না; কিন্তু এই কাটিং তিনি রাখলেন। মাঝে মাঝে অভ্যাগতদের তিনি দেখাতেন এই কাটিং আর মৃদু হাসতেন।

নিজের ফটো তোলা তিনি ভালবাসতেন না, যদিও অনেকেই স্ন্যাপ্ শট্ নিত; কিন্তু বেহালাহাতে বৈজ্ঞানিকের একটি ফটোর জন্য তিনি 'পোজ' করে দাঁড়ান একবার ফটোগ্রাফারের এই অনুরোধে যে তাঁর এই ফটো বিক্রি করে ভিয়েনার দরিদ্র ছেলেদের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হবে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভয়ানক অসুখ হয় হৃদয়-যন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার ফলে। রোগটা এত সাংঘাতিক হয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে চার মাস শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। এক বৎসর ধরে তার রীতিমত দুর্বলতা থাকে। এই রোগাক্রান্ত ও দুর্বল অবস্থায় তিনি তাঁর বিজ্ঞানের জগৎ হতে বিচ্যুত হননি। তার চিন্তা রাজ্যে নূতন প্রশ্ন, নূতন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। ফলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণ ও ইলেট্রো-মেগ্‌নেটিজম সম্বন্ধে তিনি সূক্ষ্ম গাণিতিক ব্যাখায় নূতন একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁর বয়স হয় পঞ্চাশ।

তাঁর পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জন্মোৎসব করবার জন্য বার্লিনে খুব তোড়জোড় হতে থাকে। সে একটা বিরাট আয়োজন হবে। তাঁকে ধরা দিতে হবে কয়েক দিন জন সংবর্ধনার মধ্যে। কত কোলাহল, কত আনাগোনা! এই রূপ সংবর্ধনা পেতে পেতে তিনি হয়রান হয়ে গেছেন। তারপর তাঁর স্বাস্থ্য ভালো নয়। তাই তিনি কি করলেন, জানেন? তাঁর জন্মোৎসবের প্রাক্কালে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেলেন একটা গ্রামে এক জুতা পালিশের মস্ত বড় ব্যবসায়ীর বাড়ীতে। সেখানে তিনি প্রায় লুকিয়েই থাকতেন। মাঝে মাঝে এই জায়গায় তাকে রান্না করেও খেতে হত তাঁর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল রাখবার জন্য।

১৪ই মার্চ এল। তাঁর জন্মদিন। চারদিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য কত লোকের ভীড় হতে লাগল তাঁর বাড়ীর সামনে। কত উৎসাহ, আয়োজন, চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম! কাগজে কাগজে কত প্রবন্ধ বের হতে লাগল তাঁর জীবন, বিজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পলায়িত। অভ্যাগতদের ও পত্রপ্রেরকদের সেক্রেটারী জানালেন, 'এই সংবর্ধনার সম্ভাবনার কথা ভেবেই তিনি লুকিয়েছেন; আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কাউকে কোন খবর না

দিতে।' কিন্তু খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কেউ কেউ ঠিক খোঁজটি পেয়ে গেল। আইনষ্টাইনের জন্মদিনে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তো লুকিয়ে রওনা হলেন নানারকম প্রচুর খাদ্যসম্ভার নিয়ে। পারিবারিক ভাবে তাঁরা জন্মোৎসব করবেন। তাকে তাকে ছিল সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ; গোপনে গোপনে তারাও পিছু নিল।

স্বামী, স্ত্রী, কন্যাতে মিলেতো খুব খুশী! বিশেষ করে আইনষ্টাইন খুশী এই মনে করে যে সবাইকে এবার বেশ ফাঁকি দেওয়া গেছে!

খুব মজা করে তো খাওয়াদাওয়া হল। অনেক দিন পর তিনি তাঁর পাইপ টানতে পারলেন। অসুখের জন্য ডাক্তাররা পাইপ টানতে মানা করে দিয়েছিলেন। জন্মদিনে তাঁর একটু ব্যতিক্রম হল। আইনষ্টাইন বেশ তৃপ্তির সাথে পাইপ টানতে টানতে মেয়েকে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ দেখাচ্ছিলেন। এই যন্ত্রটি জন্মদিনের উপহার পাওয়া। তিনি তখন আঙুলে সূচ ফুটিয়ে রক্ত বার করে সেই রক্তের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছিলেন কন্যাকে। এই সময় দরজায় হল মৃদু করাঘাত। কে? দরজা খোলা হতে যে এসে দাঁড়ালো, সে তার পরিচয় দিল যে, সে একটি আমেবিকান সংবাদপত্রের বার্লিনস্থ প্রতিনিধি!

তা তোমাকে কে বল্লে যে আমি এখানে আছি?' তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে তিনি বল্লেন, 'মনে হচ্ছে তোমার নাকটি বেশ উঁচু।'

এক সপ্তাহ পরে তিনি তার বার্লিনের বাড়ীতে ফিরে এলেন। এসে দেখেন ঝুরি ভরতি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম—জন্মদিনের অভিনন্দন। রাজা সম্রাট, সভাপতি, অধ্যাপক, ছাত্র, বন্ধুবান্ধব, সাধারণ লোক,—জানিয়েছে তাদের শুভ ইচ্ছা। অনেকে, পাঠিয়েছে উপহার—বেহালা, স্যুট, নেকটাই, রুমাল, বই, দাড়ী কামানোর সাবান—কত কি! কিন্তু দাড়ী

কামানোর সাবানটাকে তিনি একজনকে দিয়ে দিলেন। গায়ে দেওয়া সাবান দিয়ে দাড়ী কামানোতেই তিনি চিরদিন অভ্যস্ত।

একটি উপহার এসেছিল—ছোট এক টিন তামাক ; পাঠিয়েছিল একজন বেকার শ্রমিক। লোকটি আইনষ্টাইনকে ভালবাসতো তাঁর মানুষের প্রতি দরদ দেখে। সে তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই বুঝতো না, তবু সে এই উপহারের সঙ্গে একটি চিঠি লিখেছে, 'যদিও আমার এই উপহারটি তুলনায় (relatively) ক্ষুদ্র, তবুও এ এসেছে ভালো ক্ষেত্র (field) থেকে।'

এই চিঠিটি আইনষ্টাইনের অন্তরকে দুলিয়ে দেয়। তাঁর চোখে জল ভরে আসে। আইনষ্টাইন কবিতার ছন্দে লিখে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দেন তার।

এই পঞ্চাশৎ জন্ম-বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য বার্লিনের Astro-physical Institute-এ একটা নূতন দালান তৈরি করে তার মধ্যে আইনষ্টাইনের আবক্ষ প্রতিমূর্তি বসানো হয়। দালানটির নামাকরণ করা হয় 'আইনষ্টাইন টাওয়ার'।

আইনষ্টাইন নৌকা করে বেড়াতে ভালবাসতেন তাই তাঁর গুণবিমুগ্ধ লোকেরা ওয়ানসি নামক একটি হ্রদের ধারে কিছু জমিজমাসহ একটা বাড়ী করে দেয় এই সময়। বার্লিনের উপকণ্ঠেই এই হ্রদ। বাড়ীটির নাম দেওয়া হয় 'আইনষ্টাইন নিকেতন'। কিন্তু ভারী মজা হল আইনষ্টাইন পরিবার যখন এ বাড়ীটি দেখতে গিয়ে দেখেন, ঐ বাড়ীতে এখনও একজন মালিক আছেন। ভদ্রলোক বাড়ী ছাড়তে রাজী নন। তাঁকে না জানিয়ে কি করে এই বাড়ীটা আইনষ্টাইনকে দেওয়া হল, ত, তিনি জানেন না। বার্লিনের মিউনিসিপাল করপোরেশন জানতো এ বাড়ীটা সরকারি সম্পত্তি। কিন্তু কাগজপত্র ঘেঁটে পরে দেখা গেল তা নয়। লজ্জার

কথা। তাড়াতাড়ি ঐ হ্রদের ধারেই আর একটি জায়গা ঠিক করে নিয়ে, সেইখানে 'আইনষ্টাইন নিকেতন' তৈরি করার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু এখানেও ঝঞ্ঝাট। পরে দেখা গেল এই জমিরও একজন মালিক আছে। বার্লিন মিউনিসিপালিটির এই রূপ অব্যবস্থিত কাজের জন্য যে হাস্যকর পরিস্থিতি, তথা অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এই নিয়ে দেশ বিদেশের কাগজে কাগজে কিছু দিন লেখালেখি চলতে থাকে।

তৃতীয়বারও অনুরূপ আর একটি ঘটনা হয়। দুনিয়ার লোক তো মিউনিসিপালিটির এই কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করে; কিন্তু ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী হাস্যকর মনে হয় আইনষ্টাইনের কাছে। তিনি মিউনিসি-পালিটির কাউন্সিলারদের জানালেন, 'আপনাদের ধন্যবাদ, আপাতত আপনারা আমাকে এই দান দেবার কথা ভুলে গেলেই খুশী হব সব চেয়ে বেশী; ভুলতো সবারই হয়।'

কিন্তু মিউনিসিপালিটির কর্তারা ছাড়বার পাত্র নন। এবার তাঁরা আইনষ্টাইনের জন্য শহর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে 'আইনষ্টাইন নিকেতন' তৈরি করবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। কিন্তু এখানেও প্রহসন সুরু হল। বাড়ী কিনতে হলে টাকা চাই। এখন মিউনিসিপালিটির যদি বাড়ী কিনতে হয়, তার জন্য বৈঠক বসা দরকার। আলোচনা, হওয়া দরকার। মিউনিসিপালিটির কাউন্সিলারদের মধ্যে একদল 'জাতীয়-বাদী' ছিলেন। তাঁরা আবার আইনষ্টাইনকে এই বাড়ী দেবার, তথা মিউনিসিপালিটির টাকা এই সুবাদে খরচ করবার পক্ষপাতী নন।

এখন বৈঠক বসবে, আলোচনা হবে, ভোটাভুটি হবে, তর্ক-বিতর্কও হবে। আইনষ্টাইন জানালেন, 'অনুগ্রহ করে আমার নাম নিয়ে তুচ্ছ দলাদলির ব্যাপার ঘটিয়ে তুলবেন না।' তিনি এই সঙ্গে সরাসরি জানালেন যে, 'আমি এইরূপ 'দান' গ্রহণ করতে রাজী নই।' যাক

বাঁচা গেল। এতদিন পরে আইনষ্টাইনকে বাড়ী দেওয়ার সমস্যা মিটল।

তিনি ঐ গ্রামেতেই জায়গাটি নিজেই কিনে নিয়ে বাড়ী তুললেন পরে। জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছিল। পাশেই হ্রদ ছিল ; সে হ্রদে তাঁর নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে পাইপ টানতে টানতে ধীয়ে ধীরে বইঠা বাইতে তিনি একটা অপূর্ব আনন্দ পেতেন। অনেক সময় নৌকা ছেড়ে দিতেন এমনি ভাবেই ! ভাসতে ভাসতে নৌকা যেখানে খুশী সেখানে যেত, আর তিনি ভাবতেন, চিন্তা করতেন, হারিয়ে ফেলতেন আপনাকে নক্ষত্র ও গণিতের জগতে। একাই তিনি নৌকা নিয়ে বের হতেন বেশী। মাঝে মাঝে তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে থাকতেন।

গ্রামটির নাম ছিল কাপুথ। এখান থেকেই তাকে কার্যব্যপদেশে বার্লিন যেতে হত প্রায়ই। কিন্তু তার মোটর গাড়ী কোন দিনই ছিল না। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা বাসে এবং বাকীটা ট্রেণে করে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হতেন।

তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়ার আন্তর্জাতিক উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষা-পরিষদে (International School of Advance Science) যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এইখানে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা একত্র হয়ে প্রতি বছর কয়েক মাস ধরে পারস্পরিক সহযোগিতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন।

এর পূর্বে তিনি দশ বছর হল একবার আমেরিকায় এসেছিলেন জেরুজালেমে ইহুদীদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহের জন্য। তখন তিনি আমেরিকাবাসীদের কাছে এতোটা বিখ্যাত ছিলেন না, এখন যতোটা হয়েছেন।

লোক ও কোলাহল এড়াবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু কোন ব্যাপারে তিনি জোর করে 'না' বলতে পারতেন না। কাউকে অসন্তুষ্ট করতে তিনি পারতেন না। তাই আমেরিকায় এসেও তাকে জনতার মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে পড়তে হল কিছুদিন। তারপর সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার তো আছেই! 'এই রিপোর্টারদের সম্মুখীন হওয়া না একপাল নেক্ড়ে বাঘের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া,—' বলতেন তিনি।

আমেরিকায় নানা সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিতে বাধ্য হতেন তিনি। কখনো কখনো অপেরা বা সিনেমায় যেতেন। এরই মধ্যে তিনি যথা সময়ে যোগদান করতেন পরিষদের কাজে; এরই মধ্যে তাঁর চিন্তারাজ্যে যেন আপনার প্রয়োজনেই বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও সমাধানগুলি আসাযাওয়া করত'

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি সে-বারের মত আমেরিকা ত্যাগ করেন।

আমেরিকা ও আমেরিকানদের তাঁর ভাল লেগেছিল। বিদায়কালীন অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন, 'আমেরিকা আজ জাতি হিসাবে সবচেয়ে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত; গণতান্ত্রিকতার উচ্চ আদর্শ এখানে সুপরিস্ফুট; একদিন আসবে, যখন এই আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত হবে, আনবে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান।'

আমেরিকানদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'এ জাতি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত ও আশান্বিত, এদের জীবনযাত্রার ভঙ্গীতে বেঁচে থাকার আনন্দ ও কাজ করবার আনন্দ সুন্দর ভাবে জড়িয়ে আছে।'

এবার জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করবার পর তিনি এসে নাৎসীদের প্রবল ইহুদী-বিরোধী আন্দোলনের মুখে পড়েন। জার্মানীর রাষ্ট্র আজ নাৎসীদের দখলে। এই রাষ্ট্রীয় অধিকার পেয়েই তাঁরা প্রচণ্ড ভাবে ইহুদী বিতাড়নের কাজে লেগে গেল। ইহুদী-বিতাড়ন নাৎসি কার্যক্রমের অন্যতম অংশ। আইনষ্টাইন ইহুদী—হোক না সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ; কিন্তু সে ইহুদী ; শুধু ইহুদী নয়, শান্তিবাদী, আন্তর্জাতিকতা-বিলাসী। ইহুদীকে জার্মানীর নাগরিক অধিকার দেওয়া হবে না ; অতএব আইনষ্টাইনকেও নয় !

আশ্চর্য, যেই জার্মানীর অধিবাসীরা তাঁকে এতদিন এত সম্মান দিয়ে এসেছে, বিশেষ করে ছাত্ররা, তরুণরা ; এরাই বাইরে কোথাও আইনষ্টাইনকে দেখতে পেলে তাঁর বিরুদ্ধে অপমান-সূচক উক্তি প্রকাশ করতে থাকে। কেউ কেউ আবার মারের ভয় দেখায়। নাৎসি-রাজনীতির নেশায় এরা উন্মত্ত ; ইহুদী-বিদ্বেষের উত্তেজনায় এরা এখন কাণ্ডজ্ঞানহীন। এমন কি এক বিজ্ঞান-সভায় এই রকম অর্বাচীন লোকেরা তাঁকে অপমান পর্যন্ত করে।

ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আজ অপমানিত হলেও ইহুদীদের লাঞ্ছনা তিনি দেখে আসছিলেন বরাবর। এই জন্য প্রথম থেকেই তিনি ইহুদী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসস্থল সৃষ্টি করবার আন্দোলনে খোলাখুলি ভাবে যোগ দেন এবার। একটা নির্দিষ্ট ভিত্তিতে ইহুদী জাতি যদি একতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে একদিন স্বতন্ত্র থেকেও তারা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে পারবে তাদের সংস্কৃতি ও আদর্শবাদ দিয়ে, এই বিশ্বাস তিনি করতে থাকেন। ইহুদী জাতিকে জাতি হিসাবে বাঁচতে হবে আগে।

প্যালেষ্টাইনের সাথে ইহুদী জাতি ঐতিহাসিক ভাবে সংশ্লিষ্ট। অতীত

ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই নূতন ইহুদী জাতীয়তা গড়ে উঠবে, এই তাঁর বিশ্বাস। জাতীয়তার কথাটার তিনি পরপন্থী; কিন্তু উপায় নাই। সংহতি স্থাপন করতে হলে একটা মৃত্তিকার ভিত্তি চাই. যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ইহুদী জাতি একত্রীভূত হতে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। প্যালেষ্টাইন ঐ স্থান।

এই জন্য প্যালেষ্টাইনে তিনি একবার পরিভ্রমণে আসেন। তিনি যথাসম্ভব সংবর্ধনা ও জনতার ভীড় এড়িয়ে বিশেষ করে ইহুদী অঞ্চলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেন। তিনি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছিলেন। নূতন গড়ে ওঠা শুধু ইহুদী অধ্যুষিত টেল-আভিব শহরটি দেখে তিনি খুব উৎফুল্ল হন। ছোট্ট শহরটি ইহুদী প্রতিভায় নানা ভাবে সমুজ্জল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর একবার আমেরিকা পরিভ্রমণে মনস্থ করেন; তাঁকে আমন্ত্রণ করে অনেক আহ্বান আসছিল কিনা, তাই। কিন্তু দেখা গেল এক শ্রেণীর লোক তাঁর এই আগমনের বিরুদ্ধতা করছে। এমনকি একটি মেয়ে প্রতিষ্ঠানও তাঁর এই আগমনের প্রতিবাদ জানায়। তাঁর অপরাধ তিনি শান্তবাদী ও যুদ্ধ-বিরোধী মত পোষণ করেন। অতএব তিনি খাঁটি লাল মার্কা কম্যুনিষ্ট। মেয়েদের এই সমিতির সভ্য হওয়ার যোগ্যতা হল তাঁদের বাপপিতামহ কেউ না কেউ সৈনিক ছিল। এই সৈনিকের স্পিরিটকে নষ্ট করে দিতে চায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট বৈজ্ঞানিক! তুচ্ছ এই বা এই ধরণের প্রতিবাদ। কিন্তু আশ্চর্য! তখনকার আমেরিকান সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ঐ প্রতিবাদপত্রের একটি নকল পাঠিয়ে দেন বার্লিনে আইনষ্টাইনের কাছে। তাতে জানানো হয়, আমেরিকায় আসবার জন্য তাঁকে অনুমতিপত্র নিতে হবে।

এই খবরটি প্রকাশিত হয়ে পড়লে আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আইনষ্টাইনকে অনুমতি নেবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। তিনি আমেরিকায় রওনা হন পুনরায় কালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞান পরিষদে যোগ দেবার জন্য।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জার্মানীতে প্রত্যাবর্তনের কথা। কালিফোর্নিয়া থেকে তিনি এলেন নিউইয়র্কে। সেখানে এসে শুনলেন সমস্ত জার্মানী এখন নাৎসী কবলে। নিউইয়র্কে এসে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি ফ্যাসিষ্ট জার্মানীতে ফিরে যেতে চাই না।' অবশ্য আমেরিকার জার্মান দূতাবাস থেকে তাঁকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল বিশেষ ভাবে। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না। আমেরিকা থেকে তিনি অবশ্য রওনা হলেন ইওরোপের দিকে। তাঁর গন্তব্যস্থান এখন বেলজিয়মের কর্ক-সার-মার নামক একটি সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম। তিনি স্বেচ্ছায় এই নির্বাসিত জীবন গ্রহণ করলেন।

জার্মান সরকার তাঁকে এখানেও জার্মানীতে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। সরকারী ভাবে তারা এত বড় বৈজ্ঞানিককে দেশছাড়া করতে চাইছিল না; কিন্তু ফ্যাসিষ্ট জার্মানীতে, যে জার্মানীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট, যে জার্মানীতে দলগত একাধিপত্য বিরাজমান, যে জার্মানী শান্তি-বিরোধী ও সমরপন্থী, সে জার্মানী যে তাঁর আদর্শ দেশের ঠিক বিপরীত! এদেশে ফিরে যাবার কোন মানে হয় না, বিশেষ করে ইহুদী-বিদ্বেষ যেখানে অত প্রবল, যেখানে অন্যান্য ইহুদীরা নাৎসীদের হাতে অমন ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। অবশ্য ফিরে গেলেও তাঁর ভাগ্যে যে কি ঘটত বলা যায় না। যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে

প্রবল প্রচারকার্য সুরু হল জার্মানীতে। জার্মানীতে তখন আইনষ্টাইনের স্ত্রীর আগের পক্ষের দুইটি মেয়ে ছিল। তাঁরা নাৎসিদের অত্যাচারে পালিয়ে এল হল্যাণ্ডে। একটা নাৎসি প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করলে যে, আইনষ্টাইনের মাথা এনে দিতে পারবে যে, তাকে এক হাজার মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে। এমন কি নাৎসি বৈজ্ঞানিকরা প্রচার করতে লাগলেন যে আপেক্ষিক তত্ত্বটা আসলে ভুয়ো জিনিস, শুধু ইহুদীদের প্রচার-কার্যের ফলে আইনষ্টাইন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত; আসলে তিনি একজন কম্যুনিষ্ট—মার্কসের জ্ঞাতি ভাই।

এমন কি প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমী অফ্ সায়েন্স, যার সম্মানিত সদস্য ছিলেন আইনষ্টাইন, তারও ডিরেক্টরগণ তাঁর বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর মত প্রকাশ করতে লাগলেন। আইনষ্টাইন অ্যাকাডেমী থেকে পদত্যাগ করেন। অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ বলেন, এই পদত্যাগে তাঁরা মোটেই দুঃখিত নন, কেননা আইনষ্টাইন একজন বৈজ্ঞানিক হলেও বিদেশে গিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছেন, যা জাতীয় আদর্শের বিরোধী। অ্যাকাডেমীর সাথে রাজনীতির যোগ নেই, তবে প্রুশিয়ান রাষ্ট্রের সাথে এই অ্যাকাডেমী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত; অতএব জার্মানী তথা প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে আইনষ্টাইনের আন্দোলন সমর্থনযোগ্য নয়।

আইনষ্টাইন এই অভিমতের প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, তিনি কখনো জার্মান জাতির বিরুদ্ধে কিছু বলেননি; তিনি বলেছেন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে উৎসাহী নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর একটা দল সশস্ত্র ভাবে আইনষ্টাইনের কাপোথ গ্রামের বাড়ীতে হানা দেয়। তারা খবর পায় যে সে বাড়ীতে নাকি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুকানো আছে! কিন্তু সমস্ত বাড়ীটি তন্নতন্ন করে খুঁজে একটি মাত্র অস্ত্র পায় তারা—একটী রুটিকাটার ছুরি,

তাও আবার মরিচা ধরা! কিন্তু অস্ত্র তো পাওয়া গেছে! অতএব প্রমাণিত হল আইনষ্টাইন ইহুদী বিদ্রোহী দলের একজন সদস্য! এর পর কিছু দিনের মধ্যে শুধু তাঁর গ্রামের বাড়ীখানাই নয়, বার্লিনের বাড়ীখানাও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে আইনষ্টাইনকে দায়ী করে সে কথা সর্বত্র প্রচার করা হয়। এদিকে বেলজিয়মে আইনষ্টাইনের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা হয়ে উঠায় বেলজিয়মের পুলিশ তার রক্ষার ভার নেয়।

কিছু দিন পর তিনি লণ্ডনে আসেন। এখানে তাঁর জীবনরক্ষার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ সাবধান ও সতর্ক থাকে। তিনি এখানে নীরব ছিলেন না। তাঁর আদর্শ—আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবতার বাণী তিনি এবারও শুনান জনসাধারণকে। তবে তাঁর কোন বক্তৃতাতেই নাৎসি জার্মানীর উল্লেখ থাকতো না; তবু জার্মানীতে তাঁর বক্তৃতাগুলিকে অন্য রকম রঙ দিয়ে প্রকাশ করা হতো। জার্মানদের বলা হতে থাকে আইনষ্টাইন এখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জার্মান জাতির বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাচ্ছেন।

আইনষ্টাইন এখন গৃহহীন; নির্বাসিত জীবন তিনি যাপন করছেন। কিন্তু গুণগ্রাহী পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতো আছে। অনেক দেশ হতে আহ্বান আসে তাঁর, তিনি যেন সেই দেশে গিয়ে বাস করেন। সর্বত্রই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ার' দেওয়া হয়। তাঁর জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। তাঁর আহ্বান আসে স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চেয়ার' গ্রহণ করবার জন্য; ফ্রান্সের একটি কলেজে তাকে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করবার জন্য ডাকা হয়; ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁকে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকার দেবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু তিনি

শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে বেছে নেন ভবিষ্যৎ বাসস্থান হিসাবে। তিনি আমেরিকায় রওনা হন। আমেরিকাবাসীরা তাঁকে সাদরে ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করে। আমেরিকা নিজেকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করে। তিনি য়্যাণ্টওয়ার্প থেকে জাহাজে করে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। আজ তিনি আশ্রয়প্রার্থী, জার্মানী হতে বিতাড়িত সামান্য ইহুদীদের মত তিনিও একজন বিতাড়িত।

সেই কলম্বিয়ার প্রিন্‌সেটন ইউনিভার্সিটিতে তিনি এসে যোগদান করেন এবার স্থায়ী ভাবে। এখানে তিনি শুধু গবেষণার কাজেই লিপ্ত থাকেন। এখানকার কাজ বিশেষ ভাবে গাণিতিক গবেষণা। তাঁর কাজে সহযোগিতা করেন আরও চারজন বিশেষ গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক।

এই বিজ্ঞান পরিষদ কাজে নিযুক্ত করবার আগে আইনষ্টাইনের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কত বেতন তিনি চান। আইনষ্টাইন যত টাকা বেতন চান, পরিষদের কর্তৃপক্ষ তার তিনগুণ বেতন দিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করেন। কেননা, পরিষদ যে বেতনের মান ধার্য করেছেন, তার পরিমাণ ঐ।

প্রিন্‌সেটনের ১১২নং মার্সার ষ্ট্রীটে মধ্যম রকমের একটা দোতালা বাড়ী তিনি নিজের বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করেন। বাড়ীটির ছাদ বেশ উঁচু, সামনে সুন্দর ফুলের বাগান। তিনি, তাঁর স্ত্রী এলসা এবং স্ত্রীর আগের পক্ষের মেয়ে মার্গট—এই তিনজন হল এই বাড়ীর বাসিন্দা।

এই বাড়ীতে তিনি একটি রেডিয়ো বসান। ওটা তাঁর রীতিমত সখের ব্যাপার। জার্মানীতে থাকতে তিনি রেডিও রাখার কথা ভাবেননি, রেডিও শুনতেনও না। কিন্তু এখানে এসে দুই একবার রেডিয়োতে গানবাজনা শুনে তাঁর সুরশিল্পীর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মন্দ নয় ইজি চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে রেডিওর বুতাম ঘুরিয়ে দিয়ে নানান দেশের

গান ও সুর শুনা! কিন্তু মোটর তিনি এখানে এসেও কিনেননি। অপেরাতে বা সিনেমার ছবি দেখার সখটা তাঁর বরাবরই আছে; তবে আগে তাঁর সময় হতো কম। এবার কিন্তু একটু বেশীই যেতে লাগলেন।

কাপড়চোপড়, চলাফেরা, কোন ব্যাপারেই তিনি নিয়মকানুনের ধার ধারতেন না, একথা আমরা আগেই বলেছি। ইচ্ছা করেই তিনি বে নিয়ম করতেন না। ওটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে ছিল। টুপি তিনি কোন দিনই পরতেন না; ছাতা ব্যবহার করতেন না; যে কোন জুতা, এমন কি কার্পেটের জুতা পরেও তিনি পথে বের হয়ে পড়তেন; এবং ঐ অবস্থায় হয়তো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই নির্বিকার ভাবে পথ চলতেন আর ভাবতেন হয়তো কোন একটা নূতন গাণিতিক সমস্যার কথা।

প্রিন্সেটনের নাসাও ষ্ট্রীট একটি বিখ্যাত রাস্তা। এই রাস্তায় আইনষ্টাইন এক দিন কয়েকজন বড় বড় বৈজ্ঞানিকসহ হেঁটে চলছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন একটা লোক আইসক্রিম বেচছে। আইস্ক্রিম খাবার সখ হল তাঁর। নির্বিবাদে তারই একটা কিনে নিয়ে ছোট ছেলেদের মত বেশ আরাম করে খেতে লাগলেন। আপাততঃ খেয়াল ছিল না যে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরো কয়েকজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং তিনি হেঁটে চলেছেন সেই নাসাও ষ্ট্রীট ধরে, যে পথে পদার্পণ করেছিলেন, জর্জ ওয়াশিংটন, জেম্স্ মেডিশন, উড্রো উইলসন প্রমুখ মহারথীরা। সঙ্গী বৈজ্ঞানিকরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। আইনষ্টাইন কিন্তু আইস্ক্রিমই চুষছেনই।

আমেরিকাকে তিনি ভালবেসেছিলেন আগেকার যাত্রাতেই। এবং আমেরিকায় এত দিন থেকে এই দেশের প্রতি তাঁর গভীর মনের

টান পড়ে যায়। জার্মানীকে ভালবাসলেও হিটলারের জার্মানীতে তাঁর ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই।

তিনি নিজেরও আমেরিকান বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনি কোর্টে গিয়ে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন।

এখন তিনি আমেরিকাতেই আছেন। কাগজেপত্রে আজ তিনি আমেরিকান; কিন্তু আসলে তিনি বিশ্বের। অল্প বয়স থেকেই তিনি কোন বিশেষ দেশকে আপনার দেশ বলে মনে করেননি। তাই জুরিখে কলেজে পড়বার সময় তিনি সুইজ নাগরিক বলে পরিচিত হতে চান। পরে সরকারী ভাবে তিনি সুইজ বলেই পরিচিত হন। যখন তিনি খ্যাতির চরম শিখরে ওঠেন এবং বার্লিনে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তখন জার্মানবাসীদের একান্ত অনুরোধে তিনি জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহন করেছিলেন। সেই জার্মানী থেকেই তিনি নির্বাসিত হন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমার কোন দেশ নেই; সুইজারল্যাণ্ড-বাসীরা আমাকে বলে সুইজ, জার্মানরা বলে জার্মান; জার্মানীর প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে ফ্রান্সের কেউ কেউ আমায় বলে আমি সুইজারল্যাণ্ড-বাসীই; আমার জার্মান বিরোধীরা আমাকে বলে সুইজ ইহুদী। অন্যান্য অনেক দেশ আমাকে নাগরিক অধিকার দিতে চায়; আসলে আমি সকল দেশেরই অধিবাসী; ব্যক্তিগত ভাবেও আমি সকল দেশের।'

তবু আইনের দিক থেকে একটা নাগরিকত্ব চাই। আমেরিকাকেই যখন তিনি তাঁর গৃহ বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আমেরিকান বলে পরিচিত হতে দোষ কি!

বছরের পর বছর এখন তাঁর আমেরিকার দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। আজ তাঁর বয়স সত্তরের উর্ধে। কিন্তু তবু তিনি সেই চিরন্তন আইন-

ষ্টাইন, সেই আপনভোলা মানুষটি, সেই মাথাভরা চুল, কবির মত মুখশ্রী, পারিপার্শিক সম্বন্ধে উদাসীন। আজো তাঁর চিন্তাজগতে গণিত ও বিজ্ঞানের নয়া নয়া প্রশ্নের ও সমস্যার অবাধ আনাগোনা; আজো তাঁর বক্তৃতায় ও আলোচনায় বিশ্বমানবতা ও শান্তির বাণী; আজো তিনি পোষণ করেন যুদ্ধ-বিরোধী মত। গণতান্ত্রিকতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমান অধিকারের আদর্শ আজও তিনি প্রচার করেন তেমনি ভাবে। আজও ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য ও ব্যক্তিগত সুখদুঃখের বিষয়ে তিনি তাঁর উদার উন্মুক্ত মতগুলি প্রকাশ করেন।

বারান্দায় ডেক্ চেয়ারে বসে আজো তিনি তাঁর পাইপে আপন মনে তামাক টেনে চলেন; মাথার উপর বিদ্যুৎ-পাখার হাওয়ায় তার লম্বা লম্বা এলোমেলো চুলগুলি উড়তে থাকে; আজো দেখতে পাওয়া যায় চিন্তামগ্ন বৈজ্ঞানিক-কবি-শিল্পী আপন মনে হেঁটে চলেছেন বড় রাস্তা দিয়ে। মানুষের অভিনন্দনে তিনি প্রতি-নমস্কার জানান; কিন্তু তবু তিনি পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন।

তাঁর অন্যমনস্কতা, ও জীবনযাত্রায় খেয়ালী ভাব এখন অনেক বেশী প্রতীয়মান। বার্ধক্য অবশ্য এই জন্য কিছুটা দায়ী; কিন্তু সব চেয়ে বেশী দায়ী তাঁর স্ত্রী এলসার মৃত্যু।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'মায়ের মত', 'বোনের মত' সেবাপরায়ণা স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন স্ত্রীর প্রথম পক্ষের কন্যা মার্গট। ঘর-সংসার দেখার ভার রয়েছে ফ্রাউলাইন্ হেলেন ডুকাস নামক একটি স্ত্রীলোকের হাতে। এই বাড়ীর আর একটি অধিবাসী—একটি সুন্দর পুষ্ট কালো বিড়াল, আইনষ্টাইনের খুব প্রিয়। মার্গট

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিদ্যা শিখতেন। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে যান তিনি।

এখন আমরা আইনষ্টাইনের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করব একটি বিশেষ ব্যাপার উল্লেখ করে।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ রকফেলারদের আনুকুল্যে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কাছে একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ গীর্জা নির্মিত হয় ব্যাপটিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে। এইখানে সমস্ত যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও ঋষিদের প্রতি-মূর্তি সাজানো হয়। যীশু খ্রীষ্ট, মোসেস, কনফ্যুসিয়াস্, বুদ্ধ ইত্যাদির পাশে এই যুগের যে মনীষীর প্রতিমূর্তি বসানো হয়, তা হল আইনষ্টাইনের।

এই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয়। যীশু খ্রীষ্ট, বুদ্ধদেবের সমাসনে বসবার যোগ্য তিনি। শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবেই তিনি এই আসনের যোগ্য হতেন না, আসলে তিনি ঋষি; তাঁর শান্তির আদর্শ ও তাঁর বিশ্বমানবতা তাঁকে ঋষির পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। আর তাঁর জীবন-যাত্রার দিক থেকেও তিনি তা ছাড়া আর কিছু নন। উদাসীন ও আপনভোলা, সর্বজীবে সমভাব সম্পন্ন, সকলের প্রিয়, ধ্যানী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসীপ্রায় এই মানুষটিকে আর অন্য কি নামই বা ব্যাখ্যা করা যায়!

আইনষ্টাইনের বিজ্ঞান

আইনষ্টাইনের বয়স যখন আট বৎসর তখন আমেরিকার মিকেল্‌সন্‌ ও জার্মানীর অধ্যাপক মর্লি আলোর রশ্মির সাহায্যে 'দেশের' মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির পরিমাপ করেন। এই পরীক্ষা 'মিকেল্‌সন্‌-মর্লি পরীক্ষা' বলে খ্যাত। বহু বৎসরের সাধনায় আইনষ্টাইন এই পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্ব সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা গড়ে তোলেন, যার উপর তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পরীক্ষার সত্যতা প্রমাণিত হয়। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে মিনিটে ১১০০ মাইল বেগে। এই ধারণা গড়ে ওঠে সূর্যকে স্থির কল্পনা করে নিয়ে ও তার চার দিকে পৃথিবীর গতির স্বরূপ লক্ষ্য করে। সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ আছে বলেই এই ভাবে গতির পরিমাণ গণনা সম্ভবপর হয়। সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ বা আকাশে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক না থাকলে পৃথিবীর মধ্য থেকে পৃথিবীর গতির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর হত না। একের সাথে অন্যের তুলনা করেই গতির মাপ নির্ধারণ করা এত দিন সম্ভবপর হয়েছে।

পৃথিবী যেমন গতিশীল, তেমনি সূর্যও। তবু সূর্যের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক রেখে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান বলে পৃথিবীর গতি পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। নিউটনের এই আদর্শের ভিত্তিব উপর সমস্ত দৃশ্যমান সূর্য, তারা ইত্যাদি গতিশীল হলেও কোথাও এমন একটি নির্দিষ্ট ভাবে অবস্থিত বস্তু-পিণ্ড আছে, যা নিশ্চল। এই দৃশ্যমান সূর্য, তারার গতিশীলতার জন্য সেই বস্তু-পিণ্ডটির স্থান কোথায় তা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। নিউটনের এই ধারণাই এতদিন স্বীকৃত হয়ে এসেছে বৈজ্ঞানিক জগতে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ,তারা ইত্যাদি ঘূর্ণায়মান হলেও কোথাও কেন্দ্রে বা কল্পনাতীত

দূরত্বে সেই নির্দিষ্ট ভাবে অবস্থিত বস্তু-পিণ্ডটি আছে, যা এই বিশ্বের ভিত্তি মূলে। এই স্থির-বস্তুর সম্ভাবনা মেনে নিয়ে নিউটনীয় অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে হিসাব করে ৫০০,০০০,০০০ আলোক-বৎসর দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশ্বের রূপ দেখানও সম্ভবপর হয়েছে। এই বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ইথারের ধারণা, যার মধ্য দিয়ে কোটী কোটী মাইল পর্যন্ত দূর থেকেও আলো আসে অবলীলাক্রমে। এই ইথারের মধ্যে দিয়েই আলোর স্বচ্ছ গতি, এই ইথারের মধ্য দিয়েই তারায় তারায়, সূর্যে, চন্দ্রে, গ্রহে, উপগ্রহে চলে মাধ্যাকর্ষণের টান। এই ইথারের স্বরূপ নির্ণিত হয়েছে এই ভাবে :

ইথারে কোন বস্তু নাই। দেশের মধ্যে এ সর্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত। সমস্ত বস্তু-পিণ্ডের মধ্য দিয়ে এর অবাধ গতি। এর সাথে কোন পিণ্ডের সংঘর্ষ বাধে না। বস্তু ইথারের মধ্য দিয়ে চললেও কোন আকাশ-পিণ্ডের চলা এক বিন্দুও এদিক ওদিক হয় না। এর স্থিতি-শীলতা ও সংহতি ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। এই ইথারকে গ্যাসের মত চেপে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা যায় না। ইথার আছে বলেই তাতে বাহিত হয়ে আলো আসে, উত্তাপ আসে। ইথার না থাকলে আলো ও উত্তাপ আসতো না ; এবং আলো ও উত্তাপের অভাবে আমরা দেখতে পেতাম না, এমন কি 'জীবনে'র আবির্ভাবও হত না।

এই ইথারই তো স্থির বস্তু—নিউটনের সেই মূল চিরস্থির বিপুল বস্তু-পিণ্ডের ধারণাকে আপাতত দূরে রেখে একথা বলা চলে। ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ছুটে চলায় ইথারে যে আপেক্ষিক গতিবেগ সৃষ্টি হয়, তার হিসাব পেলেই তো পৃথিবীর সত্যিকারের গতিবেগের হিসাব পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক মিকেল্‌সন্ ও মর্লি গবেষণা আরম্ভ করলেন পৃথিবীর সম্পর্কে ইথারের গতিবেগ নিয়ে।

এখন পৃথিবী যখন পশ্চিম থেকে পুবের দিকে ঘুরছে এবং যখন কক্ষপথে সূর্য প্রদক্ষিণ করবার সময় পৃথিবীর মেরু-অক্ষ (Polar axis) সমান্তরালে থাকে, তখন স্বভাবত পৃথিবীর গতিবেগ থাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। উত্তর-দক্ষিণ দিকে কোন গতিবেগ থাকে না। মিকেল্‌সন্ ও মর্লি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইথারের সাহায্যে পৃথিবীর গতি পরিমাপের কাজে লেগে গেলেন। তাঁরা দুই ভাবে দুইটি আলোক-রশ্মি পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। একটি আলোক-রশ্মি পাঠালেন উত্তর-দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর গতির লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে আর একটি পাঠালেন পশ্চিম-পূর্ব পথে—আমাদের পৃথিবীর গতির দিকে সমান্তরালে। এই আলোক-রশ্মি, পৃথিবী যে ক্ষেত্র দিয়ে গতিশীল, সেই ক্ষেত্রে সম্মুখ দিকে গিয়ে ফিরে আসবে আবার। একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র ও প্রতিবিম্বক্ষেপক আয়না নিয়ে তাঁরা পরীক্ষার কাজে লেগে গেলেন।

এখন এই পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইথারের মধ্যে পৃথিবীর আলোর এই একই দূরত্বে ডবল পরিভ্রমণ করতে লাগবে, পশ্চিম-পূর্ব, উত্তর-দক্ষিণ যে দিকেই হোক না কেন, সমান সময়। কিন্তু পৃথিবী যখন পূর্ব দিকে ঘুরছে, তখন নিশ্চয় ইথারে আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। এই আলোড়িত ইথারের মধ্যে দিয়ে আলোক-রশ্মি যাবার সময় নিশ্চয় একটু অসুবিধায় পড়বে; কিন্তু যে দিকে পৃথিবীর গতি নেই, সে দিকে ইথারের আলোড়নও নেই। সেই দিকে যে আলোক-রশ্মি যাবে, তার কোন অসুবিধা হবে না। অতএব প্রথম আলোক-রশ্মিকে একটু বেশী স্থান পরিভ্রমণ করতে হবে ঘুরে রওনা হবার জায়গায় ফিরে আসতে গেলে। এই রকমটি হবে পৃথিবীর গতির জন্যে। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ যাত্রা করে ফিরে আসবে যে আলোক-রশ্মি, সেদিকে

পৃথিবীর গতি উপলব্ধি হবে না বলে, সহজ ভাবে তা ফিরে আসতে পারবে পূর্বেকার আলোক-রশ্মির একটু আগে।

ধরুন একটা নদীর মধ্যে ঠিক এক দিকের এক জায়গা থেকে দুটি মোটর বোট ছেড়ে দেওয়া হলো সমান গতিতে। এক মাইল গিয়ে যদি এই মোটর বোট দুটিকে রওনা হবার জায়গায় ফিরে আসতে হয় তবে তারা ফিরে আসবে একই সময়ে। কিন্তু যদি একই জায়গা থেকে স্রোতের বিরুদ্ধে একটি নৌকাকে এক মাইল গিয়ে ফিরে আসতে হয়, আর স্থির জলে ঐ একই জায়গা থেকে এক মাইল আড়াআড়ি ভাবে আর একটি যায়, এবং দুইটি নৌকারই গতিবেগ যদি এক রকম হয়, তবে প্রথম নৌকাটির একটু দেরি হবে রওনা হবার জায়গায় ফিরতে দ্বিতীয় নৌকাটির তুলনায়; তা সে প্রথম নৌকাটি ফিরবার পথে ভাঁটার টানের সাহায্য পেলেও।

মিকেল্‌সন্ ও মর্লি ভেবেছিলেন গতিবেগের সমান্তরালে ও আড়াআড়ি ভাবে আলো-রশ্মি প্রেরণ করে তাঁরা স্পষ্টতই দেখতে পাবেন পৃথিবীর গতি-মুখের সমান্তরালিত আলো-রশ্মি প্রত্যাবর্তন করছে একটু দেরিতে উত্তর-দক্ষিণ গামী আলোকরশ্মির তুলনায়। কিন্তু ফল দেখা গেল অন্য রকম। আলোক-রশ্মি ফিরে আসছে ঠিক একই সময়ে। এতটুকুও ব্যতিক্রম নেই। তা'হলে ইথার-সমুদ্র গেল কোথায়, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীরূপ জাহাজ ভেসে চলেছে গতিবেগে! দেখা গেল, ইথার যদি থাকেও, তবু তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পৃথিবীর গতির হিসাব করা যায় না। এতে মনে করা যায় যে, পৃথিবী নিশ্চল হয়েই আছে। চলমান হলে তো ইথারের অস্তিত্বের জন্যে একটি আলোক-রশ্মির ফিরে আসতে দেরি হত। তা হলে কি সত্যিই পৃথিবী গতিহীন এবং তার চারদিকে সূর্য, গ্রহ উপগ্রহ, ইত্যাদি ঘুরছে! তা'হলে তো বিজ্ঞানের সেই পুরানো ধারণায় ফিরে যেতে হয়। অন্যান্য ভাবে তো

স্পষ্ট প্রমাণিত যে পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান। তা'হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইথারের স্বরূপ কি? ইথার কি সত্যিই আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বহু বৎসর পর আইনষ্টাইন।

ফিৎস্‌গেরাল্ড সঙ্কোচন (The Fitzgerald Contraction)

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে বুঝতে হলে 'ফিৎস্‌গেরাল্ড সঙ্কোচন' নামে পরিচিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর আমাদের অনেকটা নির্ভর করতে হবে। তথ্যটা হল: ধরুন একটা মাপকাঠি খাড়া অবস্থায় দাঁড় করান আছে। এবার একটা মন্ত্র পড়ে দিলেন। ঐ খাড়া অবস্থায় কাঠিটা দিল সামনের দিকে অসম্ভব বেগে (speed) এক দৌড়। গতিপথের উপর আড়াআড়ি ভাবে থেকে এ দৌড়াচ্ছে। এবার কাঠিটাকে ঘুরিয়ে গতিপথের সাথে সমান্তরালিত করুন। গতির মুখে ছুটবার সময় এই কাঠিটা হয়ে যাবে সঙ্কুচিত ও ছোট এবং গতিপথের আড়াআড়ি থাকলে হবে অপেক্ষাকৃত বড়। 'ফিৎস্‌গেরাল্ড সঙ্কোচন' হল এই। অবশ্য এই সঙ্কোচনের স্বরূপ সাধারণ ভাবে ধরা যায় না। এই সঙ্কোচন আসলে কাঠিটাতে ঘটে না। এই সঙ্কোচন নির্ভর করে গতিবেগের উপর। এই তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত হয় মিকেল্‌সন্-মর্লি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মর্লি ও মিলার এবং আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নূতন নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল বেগে। যে পথে এই গতি, সে পথের দিকে মুখ করে পৃথিবীর বেগেই ছুটতে থাকলে কাঠিটাও সঙ্কুচিত হবে। পৃথিবী ছুটে চল্‌ছে বেগে, সেই হিসাবে কাঠিটা ঐ বেগের সমান্তরালে রাখলেই পৃথিবীর গতিবেগ এর

গতিবেগের সমান হবে অর্থাৎ এও চল্‌বে সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে। পৃথিবীর সমান গতিতে চললেও আমাদের দৃষ্টিতে কাঠিটা দেখাবে স্থির, যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী অত বেগে চললেও আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির। কিন্তু আসলে পৃথিবী এবং কাঠি দুইই চল্‌ছে বিপুল গতিবেগে। এই অবস্থায় পৃথিবীর গতি-মুখের দিকে কাঠিটাকে শুইয়ে রাখলেই সেটা হ'য়ে যাবে সঙ্কুচিত। কিন্তু আড়াআড়ি রাখলে তা হবে না। মিকেল্‌সন্‌-মর্লির আলোক-রশ্মির পরীক্ষার সাথে তুলনা করুন। উত্তর-দক্ষিণ মুখে পৃথিবীর গতিবেগ নেই। অতএব এই ভাবে রাখলে স্থির অবস্থায় কাঠিটি গতিবেগ পাবে না।

কিন্তু তা বলে কাঠিটা সঙ্কুচিত হবে কেন? তা বটে, সঙ্কোচন কি আর বুঝতে পারা যায়! তবে বৈজ্ঞানিকরা আমাদের বুঝিয়েছেন। আমরা যদি মনে করে থাকি কাঠিটি নিছক বস্তু মাত্র এবং কিছুটা দেশ দখল করে আছে, তা হলে ভুল করেছি। আসলে বৈজ্ঞানিকের এই কাঠিটা হল অসংখ্য বিদ্যুৎকণিকার সমষ্টি। এই কণিকাগুলি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে এবং একটি কণিকা থেকে আর একটি কণিকার মধ্যে বেশ ফাঁক আছে। তা হলে প্রশ্ন উঠবে যে বিদ্যুৎকণিকাগুলি ছুটে গিয়ে কাঠিটাকে গ্যাসে পরিণত করে না কেন? তার কারণ, ঐ কণিকা-গুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক টানও আছে। এই টানের ফলে একটা আকৃতি নিয়ে থাকে কাঠিটা। ছুটে যাবার ও কাছে আসবার টানের জোর এক রকম বলে কাঠিটা আর উবে যায় না; ঠিক এক অবস্থায় থাকে। এখন কাঠিটাকে যদি ছুটতে দেওয়া হয় গতিমুখে, তা'হলে এর মধ্যের বিদ্যুৎ-কণিকার আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটে। বিদ্যুৎ গতিশীল হলে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ যদি স্থির থাকে, তবে বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তির উদ্ভব হয়, যা

গতিশীল বিদ্যুৎতের ফলে প্রস্তুত শক্তির তুলনায় ভিন্ন রকমের। স্থির বিদ্যুৎ চুম্বকশক্তির উদ্ভব করে না। অতএব বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত শক্তির মধ্যে দিয়ে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তার রূপ ভিন্ন। এখন কাঠিটাকে গতিসম্পন্ন করলেই এর মধ্যেকার বিদ্যুৎকণিকাগুলির মধ্যে নূতন চুম্বক শক্তির আবির্ভাব হবে। ফলে কাঠিটার আগের অবস্থা আর থাকবে না। বাইরে থেকে (বুঝতে পারা যাক বা না যাক) এই কারণেই কাঠির দীর্ঘতার মাপের পরিবর্তন হয়।

গতিশীল হলেই কাঠিটি একটা নূতন চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে পড়বে। স্থির অবস্থায় এর চুম্বকক্ষেত্র এক এবং চঞ্চল অবস্থায় হবে আর। এই নূতন ক্ষেত্রের মধ্যে নূতন চাপে পড়ে কাঠিটা হবে সঙ্কুচিত। তা বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে কাঠির বস্তু-কণাগুলি এই চাপে পড়েছে। রবারকে যেমন চেপে ছোট করা যায় ঐ রকম ব্যাপার এখানে হয় না। পরিবর্তন হয় বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির পরস্পরে সম্পর্কের ব্যাপারে। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে বস্তু বেগবান হয়। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের গতির পরিবর্তনের ফলে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় বস্তুর মধ্যে। অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবেও তা প্রমাণিত হয়েছে।

গতির মুখে কাঠিটি যেমন সঙ্কুচিত হয়, মাপ কাঠিতেও তাই হয়। পৃথিবীর গতির দিকে লম্বালম্বি রাখলেই মাপকাঠিটা হয়ে যাবে সঙ্কুচিত ; কিন্তু আড়াআড়ি রাখলে তা হবে না। এতদিন সব কিছু মাপা হচ্ছিল ঠিক ঠিক ভাবে মাপকাঠির হিসাবে। এবং তা ঠিক হবেও ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবে তা হবে না। পৃথিবী যদি গতিশীল না হত, তবে এই সমস্যা দাঁড়াতো না। পৃথিবী চলছে, অতএব তার গতিমুখে লম্বালম্বি ভাবে রাখা মাপকাঠিও চলছে। ফলে মাপকাঠির হচ্ছে সঙ্কোচন। দুনিয়ার কাজ অবশ্য এই মাপ কাঠিতেই চলে যাবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবে, আসলে কাঠিটার সঙ্কোচন-প্রসারণ হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে (যে গতিতে সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘোরে) কাঠির যা সঙ্কোচন হয়, তা তার ২০০,০০০,০০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। পৃথিবীর ব্যাসার্ধে এই সঙ্কোচন ঘটে ২½ ইঞ্চি মাত্র; কিন্তু ধরুন, যদি পৃথিবী সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল বেগে চলত, তা'হলে হিসাব করে দেখানে যেতো কাঠিটার অর্ধেক সঙ্কুচিত হয়েছে, অবশ্য যদি পৃথিবীর গতি-মুখের দিকে যদি এর মুখ রাখা যেতো। আড়াআড়ি ভাবে পুরাই থাকতো বস্তুটি।

আকাশে একটি নীহারিকাখণ্ড বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। এর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল। আর এক সেকেণ্ডে পৃথিবীর গতিবেগ হল ১৯ মাইল। আচ্ছা ধরুন, ঐ নীহারিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আছেন। তাঁরা পৃথিবীর গতিবেগ লক্ষ্য করছেন টেলিস্কোপ দিয়ে। তাঁরা কি দেখবেন পৃথিবী ১৯ মাইল বেগে চলছে? না, তাঁরা দেখবেন পৃথিবীও চল্‌ছে সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে। কেননা তাঁদের পরিমাপের হিসাবে তাই দেখা যাবে। আমরা দেখছি ১৯ মাইল বেগে পৃথিবী চলেছে, আর ওঁরা নীহারিকা থেকে দেখছেন পৃথিবী চল্‌ছে ১০০০ মাইল বেগে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কেন? ওঁরা নিজেরাই হাজার মাইল বেগে চল্‌ছেন বলে ওঁদের হিসাবে পৃথিবীর গতি প্রতীয়মান হবে সেকেণ্ডে হাজার মাইল। কিন্তু প্রতীয়মান কথাটা এখানে প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, প্রশ্ন জাগে আমাদের হিসাব ঠিক না ওঁদের হিসাবে ঠিক। তাই নয় কি? আমাদের মাপকাঠি দিয়ে আমরা মেপে দেখছি ঐ নীহারিকা চলেছে হাজার মাইল বেগে আর ওঁদের মাপকাঠি দিয়ে ওঁরা হিসাব করে দেখেছেন পৃথিবীর বেগ সেকেণ্ডে হাজার মাইল। তা হলে দুই জায়গারই মাপের হিসাব কি একই রকম? তবে আমরা কেন দেখছি পৃথিবী চল্‌ছে সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে?

আমরা আগে দেখিয়েছি যে পৃথিবীর গতিবেগ যদি ১৬১,০০০ হয় সেকেণ্ডে, তবে গতির মুখে বসানো মাপকাঠিটার দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে যাবে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে কি জিনিসটা অর্ধেক হয়ে যায়? না। পরিবর্তন ঘটে বস্তুটির অবস্থিতির উপর। আমাদের দৃষ্টিতে বস্তুর সঙ্কোচন ধরা পড়ে না। কেননা বস্তুটি প্রত্যক্ষ ভাবে সঙ্কুচিত হয় না।

আপনি যদি একটা সমতল আয়নার সামনে দাঁড়ান তা হ'লে আপনি আপনার যে প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন, তাতে বিশেষ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে না। কিন্তু যদি একটা পেট উঁচু করা খাড়া ভাবে রাখা আয়নার সামনে দাঁড়ান, তবে আপনার নিজের তুলনায় প্রতিবিম্বটিকে বেশ পাতলা দেখাবে। ঐ আয়নাটাকে লম্বা ভাবে মাটিতে শুইয়ে রেখে তাতে যদি আপনার প্রতিরূপ দেখেন, তবে দেখতে পাবেন, আপনার প্রতিবিম্বকে আপনার তুলনায় যেন বেঁটে। আপনি তো দেখবেন আয়নার প্রতিবিম্ব লম্বা বা ছোট, পাতলা বা মোটা। এবার আসুন একটা মাপবার গজকাঠি। আপনি মেপে দেখবেন দৈর্ঘ্যে আপনি ৭২ ইঞ্চি। ঐ গজকাঠি আপনার সামনে ঐ মাপের ভঙ্গীতে ধরুন। এবার তাকান আয়নার দিকে। দেখতে পাবেন আয়নাতে প্রতিফলিত গজ-কাঠির ইঞ্চির মাপও ৭২ ইঞ্চি লেখা, যদিও তা আয়নাতে আরো লম্বা বা আরো ছোট হয়েছে আপনার হাতের গজকাঠির তুলনায়। প্রতিবিম্বের হাতে থাকা গজকাঠির হিসাবে প্রতিবিম্বটিও ৭২ ইঞ্চি। আয়না এবার রাখুন। আড়াআড়ি ভাবে আপনার কাঁধের মাপ নিন—দেখা যাবে ১৮ ইঞ্চি, অর্থাৎ আপনার দৈর্ঘ্যের ৭৬ ইঞ্চির এক চতুর্থ ভাগ। এর প্রতিফলনও আয়নাতে দেখা যাবে ১৮ ইঞ্চি। কিন্তু যদি প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্যের সাথে এর প্রস্থের তুলনা করেন, তবে দেখতে পাবেন আয়নাতে আপনি যতটা লম্বা তার ছয় ভাগের এক ভাগ হলেন আপনি প্রস্থে

(আয়নার মধ্যে)....উচিত ছিল আয়নার মধ্যে দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ হওয়া এক চতুর্থাংশ। কিন্তু তা হল না। অতএব দেখা গেল আয়নার জগতে ঠিক আয়নার হিসাবেই প্রতি ক্ষেত্রে মাপের হিসাব এক হয় না।

ধরুন যদি আপনি এবং আপনার চারদিকের সমস্ত বস্তু কাল ভোরে ঘুম ভাঙ্গার পর দৈর্ঘ্যে ঠিক ডবল হয়ে যায় এবং আপনার দৃষ্টির সীমাও সেই হিসাবে ডবল হয়ে যায়, তা'হলে আপনি কি বুঝতে পারবেন সত্যি সব কিছু ডবল হয়েছে ? না। তার কারণ আপনার ৭২ ইঞ্চির মাপ-কাঠিটা কালকের তুলনায় ১৪৪ ইঞ্চি হলেও ওতে চিহ্ন থাকবে ৭২ ইঞ্চিই। আপনার প্রসারিত দৃষ্টিও সেই অনুপাতে দুটি ইঞ্চির দাগের ফাঁকের মধ্যে যে বিস্তৃতি ঘটেছে তা বুঝতে পারবে না। তা'হলে এই যে ডবল হল, এই পার্থক্য আপনি বুঝবেন কি করে ? বুঝতে হলেই একটা স্থির-অবস্থিত কিছু চাই যার সাথে তুলনা করে মাপের স্থিরতা ঠিক করা যায়। প্রতিদিনের ক্ষেত্রে এই আপাতত স্থির-বস্তু পাই বটে, যেমন সূর্যের ক্ষেত্রে পৃথিবী। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে সেকেণ্ডে ১৯ মাইল বেগে। এই হিসাবটা করি সূর্যের তুলনায়। এখন ধরুন সূর্য যদি না থাকতো, আকাশে যদি গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, তারা, নীহারিকা ইত্যাদি না থাকতো, থাকতো শুধু অসীম বিস্তৃত দেশে এই পৃথিবী নামক একটি আকাশ-পিণ্ড, তা' হলে কত মাইল বেগে এ ছুটে চলেছে, অথবা একান্ত ছুটে চলেছে কি না তার হিসাব করা যেত কি করে ? যেত না। সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল ; দূর নীহারিকা—যার নিজস্ব গতিবেগ আছে, তার তুলনায় পৃথিবীর গতি সেই ১৯ মাইলই হতে যাবে কেন ? সূর্যের চারদিকে একটা নির্দিষ্ট স্থির সম্পর্কে রেখে পৃথিবী ছুটছে। সেই হিসাবে গতিবেগের একটা হিসাব করা যায়।

কিন্তু অন্য তারকা, নীহারিকার তুলনায় গ্রহ-উপগ্রহ সুদ্ধ সূর্যের সম্পর্কে যে কি তার গতিবেগ এটা স্থির হিসাব করে দেখাতে গেলে আমরা যে হিসাবটা পাব সেটা কি আপেক্ষিক নয় ? কোন একটি তারা সম্পর্কে সূর্য একটা বেগে ঘুরছে, অন্য একটি তারার পক্ষে সূর্য সেই একই বেগে যে ঘুরবে তার কি মানে আছে ?

মিকেল্‌সন্‌-মর্লি, লরেন্‌ৎস্‌ ইত্যাদির পরীক্ষা ও গবেষণায় এই ধরণের প্রশ্নগুলি জেগেছিল। তাঁরা মীমাংসা করতে পারেননি কিন্তু। মীমাংসা করেছেন আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইন প্রমাণ করেছেন যে কোন বস্তুর মাপ এবং অবয়ব নির্ভর করে যে-গতিতে ও যে-দিকে এ চলমান সেই অবস্থার উপর। সাধারণ গতিবেগে এই পরিবর্তনটা সামান্যই দেখায়। কিন্তু কোন বস্তু সেকেণ্ডে ১৬০,০০০ মাইল গতিবেগে যদি ছুটে যায়, তবে বস্তুর মাপ হয়ে যায় অর্ধেক পৃথিবীর মানুষের মাপের হিসাবে। যে মানুষটি ঐ বেগে ছুটে যাবে, সে এই পরিবর্তন বুঝতে পারবে না। আলোর গতিবেগই হলো সব চেয়ে বেশী। প্রকৃতির কোনো শক্তিই একটি ক্ষুদ্র বস্তুকণাকেও এর চেয়ে বেশী বেগে পরিচালনা করতে পারে না। আলোর চেয়েও বেশী গতিবেগে কোনো বস্তুকে চালাতে হলে আরো প্রবল শক্তি চাই। আইনষ্টাইন এই উপায়ে প্রমাণ করেছেন যে, বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে এর গতিবৃদ্ধির সাথে। বস্তু-পরিমাণ স্থিরও নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়। এর মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যদি কোন বস্তু আলোর চেয়েও তীব্র গতিতে ছুটতে পারে, তবে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখা যাবে বস্তুটি উল্টা দিকে যাচ্ছে। অতখানি বুঝতে হলে গোড়ার দিকটা নিয়ে আরো বিচার করে দেখা যাক।

আবার সেই নীহারিকাবাসী বৈজ্ঞানিকের প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি জগৎটাকে দেখছেন তাঁর দৃষ্টিতে, মাপছেন তাঁর মাপকাঠিতে। তাঁর

পর্যবেক্ষণের সীমার মধ্যে যে জগৎ, সে-জগতে অবস্থিত সূর্য, তারা গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির দূরত্ব তিনি তাঁর মাপকাঠি দিয়ে মেপে ঠিক করবেন। ধরুন ঐ নীহারিকার গতিবেগ প্রচণ্ড। ফলে এই হবে যে, সেখানকার বৈজ্ঞানিকের মাপকাঠি গতিমুখে রাখলে খুব ছোট হয়ে যাবে। এর ফলে কোন এক দিকের দূরত্ব মাপবার সময় দূরবর্তী বস্তুকে বেশী দূরে দেখাবে। এদিকে পৃথিবীতে আমরা মাপের হিসাব পাব আমাদেরই মাপকাঠির হিসাবে। তাঁরা যেখানে বেশী দূরত্বে দেখবেন, আমরা সেখানে দেখব কম দূরত্বে, যদি তাঁদের গতিবেগ আমাদের চেয়ে বেশী হয়। কিন্তু কাদের গতিবেগ বেশী তা হিসাব করবার কোন স্থায়ী কিছুর অস্তিত্ব নাই। নীহারিকা যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, পৃথিবীর অবস্থানও সেই ব্রহ্মাণ্ডে। পার্থক্য হলো আমাদের দেশকাল ও তাঁদের দেশকালে।

দেশ বা space বলতে আমরা সাধারণত বুঝি একটা শূন্য ও বিস্তৃতি! আমরা মেপে থাকি তাকে এত হাত, এত বিঘা, এই হিসাবে। সময় সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা ঐরকম। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, এক মিনিট, দুই মিনিট, এই ভাবে আমরা সময়ের পরিমাপ করি। অর্থাৎ আমাদের মাপকাঠি দিয়ে আমরা দেশ ও সময়ের পরিমাণ ঠিক করে নেই। তেমনি নীহারিকার মাপকাঠি দিয়ে নীহারিকার বৈজ্ঞানিক তাঁর দেশকালের পরিমাপ করেন। যদি নীহারিকার গতিবেগ আমাদের গতিবেগের চেয়ে বেশী হয়, তবে নীহারিকার 'দেশ' আমাদের 'দেশের' চেয়ে বেশী বিস্তৃত হবে। আমাদের 'দেশে'র কাঠামো ও তাদের 'দেশে'র কাঠামো দুটা আলাদা। পর্যবেক্ষকের গতিবেগের উপর 'দেশে'র কাঠামোটা নির্ভর করে। পৃথিবীর গতিবেগ এবং আর একটি তারার সংশ্লিষ্ট গ্রহের গতি-বেগ যদি সমান হয়, তাহলে এই উভয় গ্রহ থেকে অন্য একটি জ্যোতিষ্ক সমান দূরত্বেই দেখা যাবে।

আমরা যখন খুব ভালো দূরবীন দিয়ে আকশের একটি জ্যোতিষ্ককে দেখি আর যখন খালি চোখে ঐটিকে দেখি,—আমাদের দেখা কি এক রকম হয়? সহজ ভাবে আমরা চাঁদকে দেখি এক রকম একটা দূরত্বে; আবার দূরবীন দিয়ে চাঁদকে দেখতে গেলে দেখব চাঁদের রূপ অন্য রকম এবং তার দূরত্বও অন্য রকম।

আমরা যদি দূরবীনের লেন্সের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ দিয়ে দূরে কোন জ্যোতিষ্ককে দেখি, আর যদি খুব শক্তিশালী দূরবীন যন্ত্রে ফটোর সাহায্যে ঐ একই বস্তু দেখি, তাতে আমাদের 'দেশে'র বিস্তৃতির মধ্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কের স্বরূপ বদলে যায় না। শুধু শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্য 'দেশে'র আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্য জানতে পারি, যা সাদা চোখে দূরবীনের সাহায্যে জানতে পারা যায় না। আকাশে কোন বস্তুর দূরত্ব নির্ধারণে অসামঞ্জস্য থাকে না, যদি দর্শকের গতিবেগের পরিবর্তন না হয়। আর একটি দর্শক অন্য জ্যোতিষ্ক থেকে যদি অতিশয় বেগে চলতে থাকে জ্যোতিষ্কেরই গতিবেগে, বস্তুর দূরত্ব সে দেখবে তাঁর দূরত্ব নির্ধারণের ব্যবস্থায়। তার দৃষ্টিতে এ দেখায় কোন অসামঞ্জস্য থাকবে না, যদিও পৃথিবীর দেখায় ও তার দেখায় পার্থক্য থাকবে। এই দুই রকম যে দূরত্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা—এই হল দুই রকম কাঠামো। বিভিন্ন গতি-বিশিষ্ট দর্শকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দেশের কাঠামোর মধ্যে লক্ষ্য-বস্তু দেখা হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাঠামোতে ঠিক।

এই যে স্থান নির্ধারণ, এটা কোন মানসিক ক্রিয়া নয়, এ হল বৈজ্ঞানিক সত্য।

এই যে দেখায় বা দূরত্ব নির্ধারণে পার্থক্য, এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই তথ্যের ভিত্তির উপর যে, আমাদের মাপকাঠি সব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়; কেন না দর্শকের গতিবেগের উপর মাপকাঠির সঙ্কোচন-প্রসারণ

নির্ভর করে। তা ছাড়া বস্তুর বৈদ্যুতিক স্বরূপও এই জন্য দায়ী। বস্তু যে আসলে বিদ্যুৎজাতীয়—এই তথ্যটা আবিষ্কৃত হওয়ায়ও মাপ-জোখের এই পার্থক্যের কারণ বুঝা যায়।

সাধারণ ক্ষেত্রে মাপতো ঠিকই হয়। পৃথিবীর ভিতরকার মাপ-জোখ আমরা ঠিক ঠিক ভাবেই করতে পারি। কিন্তু যখন আকাশের অন্য জ্যোতিষ্ক বা নীহারিকাবাসীর হাতের মাপযন্ত্রের কথা বিচার করি, তখন দেখতে পাই মাপকাঠিটা আমাদের নিজেদের কাছে খাঁটী হলেও তাদের কাছে আমাদের মাপ ঠিক নয়।

আপেক্ষিক তত্ত্ব

দেশের কোন কাঠামোটা খাঁটী ? বিভিন্ন দর্শক যখন বিভিন্ন কাঠামোর মধ্য দিয়ে জগৎকে দেখছে, সে ক্ষেত্র কার কাঠামোকে খাঁটী বা সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে ?

এর উত্তর দিয়েছেন আইনষ্টাইন। পরম বা absolute কাঠামোর প্রশ্নই জাগে না। একজন তারকাবাসী দর্শকের দেশের কাঠামো, একটি নীহারিকাবাসী দর্শকের দেশের কাঠামো আর সূর্যলোকবাসী পৃথিবীর অধিবাসীর দেশের কাঠামোর গঠন আলাদা আলাদা। দেশের গঠন নির্ভর করে 'দৃষ্টি-ভঙ্গী'র উপর। এই relative বা আপেক্ষিক দূরত্ব, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি, যা দিয়ে দেশকে মাপা যায় তা'ও এই রূপ আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত। একটি নক্ষত্র থেকে দেখা কোন বস্তুর দূরত্ব যেমন সে দিক থেকে ঠিক, অন্য একটি নক্ষত্র হতে দেখা ঐ বস্তুটির দূরত্বের হিসাব এর দিক দিয়েও ঠিক। য়্যাব্‌সল্যুট্ দূরত্ব বলে কিছু নেই। এ যা দেখছে এও সত্য, ও যা দেখছে তাও সত্য।

তারপর একটি দেশের কাঠামো অনুযায়ী সে দেশের সমস্ত

পদার্থের পরিমাপের বিচার হবে। অতএব এই পদার্থের মাপও আপেক্ষিক।

ধরুন আপনার টেবিলটি ; এটাকে আপনি আপনার মাপের হিসাবে দেখছেন। যদি আপনি অন্য নক্ষত্রবাসী হন, আপনার মাপের হিসাব বদলাবে ; তখন এই টেবিলটি যদি সেখানে থাকে, তখন তার মাপ হবে সেই হিসাবেই।

ধরুন এই পৃথিবীর মধ্যেই কোন স্থির-বস্তুতে বৈদ্যুতিক চার্জ করা হল। চার্জ-করা অবস্থায় এ সৃষ্টি করল একটা বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র ; কিন্তু চুম্বক-ক্ষেত্র নয়। নীহারিকা থেকে যদি কোন দর্শক এই পৃথিবীর বস্তুটিকে দেখে, তবে দেখবে, এই বস্তুটি সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল বেগে চল্‌ছে, যদি ঐ নীহারিকার নিজেরই গতিবেগ থাকে ১০০০ মাইল সেকেণ্ডে। বৈদ্যুতিক চার্জ-সম্পন্ন চলমান বস্তু একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটিজমের নিয়ম অনুসারে এই অবস্থায় একটি চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তা'হলে কি দেখছি না একই বস্তু চুম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে এবং সৃষ্টি করছে না। এখন এত দিনের বিজ্ঞানের থিয়োরী অনুসারে আমরা বলতে পারি, এরকম হতে পারে না : হয় চুম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্ট হচ্ছে, অথবা হচ্ছে না। দুটোর মধ্যে একটাকে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে দুটোই গ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর হিসাবে চুম্বক-ক্ষেত্র নাই, নীহারিকার হিসাবে চুম্বক-ক্ষেত্র আছে। দেশের দুইটি বিভিন্ন কাঠামোর জন্য এই পার্থক্য সৃষ্ট হয়েছে। নীহারিকার বৈজ্ঞানিক তাঁর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে পৃথিবীর এই বস্তুটির চুম্বক-ক্ষেত্র ধরতে পারবে, কিন্তু পৃথিবীস্থ বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রে তা ধরা পড়বে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তবে আসলে কি কোন চুম্বক-ক্ষেত্র নাই ? এর

উত্তরে বলা যায় চুম্বকক্ষেত্র ঠিকই আছে, তবে আপেক্ষিক বা সম্বন্ধযুক্ত-ভাবে। পরম সত্য হিসাবে এই রকম কিছু নাই।

জগতের সমস্ত কিছুই গতিশীল। এই জন্য বিভিন্ন দর্শকের দৃষ্টিতে জগতের এক এক কাঠামো পরিদৃশ্যমান। যদি জগৎ নিশ্চল থাকতো, তা'হলে পরিমাপের কোন পার্থক্য হত না। সব কিছুই একই হিসাবে মেপে তার ঠিক দূরত্ব, ওজন, আকৃতি ইত্যাদি মেপে দেখানো যেত। •

গতিশীলতার জন্য আমরা সব কিছুরই মাপ পাই আপেক্ষিক বা সম্বন্ধ-যুক্ত ভাবে। সব কিছু তাই আপেক্ষিক। কিন্তু এমন কতগুলি কিছুও আছে, যাদের 'পরম' বা absolute বলা চলে। যেমন সংখ্যা। পৃথিবী থেকেই হোক বা নীহারিকা থেকেই হোক ১, ২, ৩ গণনাটা দুই স্থানের বৈজ্ঞানিকদের হবে এক রকম। আমাদের তিন হাত এবং তাঁদের তিন হাত মাপের দিক দিয়ে ছোট বড় হতে পারে, কিন্তু মাপকাঠির তিনটি জায়গায় চারটি দাগ পড়বে না। সংখ্যা তাই absolute. এই জন্য গণিতের সমস্ত সংখ্যা—যোগ, বিয়োগ, গুণ, অঙ্কশাস্ত্রের বড় বড় সংখ্যা সবই 'পরম'—যদিও তা বস্তু নয়। কিন্তু 'দূরত্ব'টা পরম নয়। 'ফিৎস্‌গেরাল্ড সঙ্কোচন' তত্ত্ব থেকে একথাটা আমরা জানতে পারি। তাছাড়া দূরত্বটা দেশরূপের বা কাঠামোর উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর হিসাবে দূরত্ব আর স্বাতি নক্ষত্রের হিসাবে দূরত্ব এক নয়।

কাল

আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে দেশ ও কাল পরস্পর বিজড়িত। কালকে বাদ দিয়ে আইনষ্টাইনের দেশের কল্পনা করা যায় না, দেশকে বুঝানোও যায় না। দেশ, কাল, এবং চলমান বস্তুপিণ্ডের গতিবেগ—এরা পরস্পরের

সাথে এমন ভাবে সম্পর্কিত যে একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। গজকাঠির মত ঘড়ির মাপে আমরা পৃথিবীর সময় নির্ণয় করতে পারি; কিন্তু যখনই ব্যাপ্ত বিশ্বজগতের প্রশ্ন আসে, তখনই সময়ের রূপ হয় আলাদা। প্রত্যেকটি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকার নিজস্ব স্থানীয় সময় আছে। এই সময় তাদের নিজ নিজ গতিবেগের উপর নির্ভর করে।

যখন সূর্য ওঠে, তখন আমরা বলি ৬টা বাজলো। ধরুন ঘড়িটা বন্ধ ছিল; সূর্য ওঠার সঙ্গে মিলিয়ে ঘড়ির কাঁটা VI চিহ্নিত দাগের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এবার ঘড়িটা চালিয়ে দিলাম। কাঁটাটা ঘুরে যখন VII-এর দাগে যাবে, তখন আমরা বলব এক ঘণ্টা হল। VI-টা বাজার ঘটনা থেকে VII-টা বাজার ঘটনা পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বলি এক ঘণ্টা। এই যে সময়কে ভাগ করা হল, এটা আমাদের আরোপিত। সময় সম্বন্ধে ধারণা করতে হলেই আমাদের দুটি ঘটনার প্রয়োজন হয়। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে রওনা হয়ে যখন আবার সেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৃথিবী আসবে তখন হবে এক বৎসর। রওনা হওয়া হল একটি ঘটনা, পৌঁছা হল একটি ঘটনা। এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী কালকে বলি সময়। এই ভাবে আমরা পাই সময়ের হিসাবে বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, সেকেণ্ড, পল, অনুপল।

এখন কথা হচ্ছে পৃথিবী গতিশীলা বলেই এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলেই আমরা সময় কি তা জানতে পারি। পৃথিবী যদি চুপচাপ বসে থাকতো এবং সূর্য যদি না উঠতো, তা'হলে কি সময়ের এই রূপ দেখতে পারতাম আমরা? বৎসর, ঋতু, দিন, ইত্যাদি কিছুই আমরা বুঝতে পারতাম না। প্রত্যেকটি গ্রহ আপন গতিবেগে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এবং সেই হিসাবে তাদের বৎসর, দিন হয়। বিভিন্ন গ্রহে তাই সময়ের হিসাব আলাদা।

যদি পৃথিবী তার গতিবেগ ডবল করে দিত, তবে বৎসর হত ৬ মাসে; তার আহ্নিক গতিবেগ যদি ডবল হত, তবে দিন রাত্রি মিলিয়ে হত বারো ঘণ্টা, যদি আমাদের গৃহীত ঘড়ির মাপে তা মাপতে চাই। এই নূতন হিসাবে আপনার বয়স ৭২ না হয়ে হত ১৪৪, ৩৬ না হয়ে হত ৭২।

আপনারা জানেন যে আমরা সবাই দেখি আলোর সাহায্যে। আলোই আমাদের দৃষ্টিকে বহন করে নিয়ে যায়। একথাতো শুনেছেন যে তারার দেশে পৃথিবীর আলো যেতে বা তারার দেশ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর লাগে।

ধরুন: পৃথিবীতে এই মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটলো: কিছু দিন আগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই ধরুন না। এখন এই যুদ্ধের ঘটনা-রূপকে আলোর পথ ধরে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পৌঁছতে বহু আলোক-বৎসর লেগে যাবে। সেদিনের মহাযুদ্ধের ঘটনাটা তারকবাসী দর্শক দেখবে (যদি দেখবার মত দর্শক থাকে যন্ত্র হাতে নিয়ে) ঐ লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর পরে।

আমাদের কাছে যেটা সেদিনের ঘটনা আমাদের হিসাবে, নক্ষত্র-বাসীর কাছে সেটা লক্ষ বা কোটী বৎসর পরের ঘটনা। এখন যে মুহূর্তে নক্ষত্রবাসীর চোখে পৃথিবীর এই যুদ্ধের দৃশ্য পড়বে, সেই মুহূর্তে সে ভাববে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আলোর গতিবেগ ও যার যে রকম ঘড়ি, এই দুইয়ের উপর সময় নির্ভর করে। সময় এই রূপে নির্ভরশীল বলেই সম্বন্ধ-যুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক।

আমরা দেখলাম আমাদের যা বর্তমান, তারার কাছে তা সুদূর ভবিষ্যৎ। অতএব কোন সময় কোন ঘটনা ঘটলো, এটা জানা নির্ভর করে দর্শকের উপর। দুটি নক্ষত্রবাসী যদি সমান গতিসম্পন্ন হয় এবং পৃথিবী হতে সমান দূরে থাকে তবে তারা পৃথিবীর একটি ঘটনাকে একই সময়ে

দেখবে। এর তারতম্য হলে তাদেব কাছে ঘটনা ঘটার সময়েরও তারতম্য হবে।

এই ভাবে আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন যে সময়কে মাপার উপায় হল কোন গতিশীল বস্তু কতদূর পর্যন্ত গেল সেই হিসাব দিয়ে। সময়ের পরিমাপ নির্ভর করে বস্তুর গতির উপর। আর গতির বিস্তারের জন্য চাই দেশ বা space. অতএব দেশ ও গতির সঙ্গে সময়ও সংশ্লিষ্ট। এই বিশ্বের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব সময়কে বাদ দিয়ে। বস্তুতঃ দেশ বা space-এর পরিমাপ আমরা এতদিন করে এসেছি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ দিয়ে। অর্থাৎ বস্তুকে মেপেছি আমরা এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ দেখে। কিন্তু সে মাপায় ভুল আছে। কালকে দিয়েও দেশকে পরিমাপ করতে হবে।

আমরা শিশুকাল থেকেই জেনে এবং বুঝে আসছি যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—এই দিয়েই বস্তুর পরিমাপ হয়; শুনে আসছি বক্রতা, সরল রেখা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত ইত্যাদির কথা। ইউক্লিডের জ্যামিতির এক মাত্র কারবার হল এই তিন প্রকার পরিমাপ নিয়ে। এখন আইন-ষ্টাইন বলছেন, শুধু এই তিন পরিমাপ দিয়ে বস্তুর ঠিক ঠিক মাপ হয় না, এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে গতি ও গতি-সংশ্লিষ্ট সময়কে।

দুনিয়াটা ছুটে চলছে প্রবল বেগে। অতএব এই মুহূর্তে আমি যেখানে বসে আছি, পর-মুহূর্তে আমি সেখানে নেই। পৃথিবী ঘুরেও আগের সেই জায়গায় আসবে না। কেন না, সমস্ত সৌরজগৎ নিয়ে সূর্য ছুটে চলেছে অসীম বেগে দেশের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে। কালকের সকালের ৬টা বাজাকে আমরা যেমন ফিরিয়ে আনতে পারি না, তেমনি ফিরিয়ে আনতে পারি না আজকের এই মুহূর্তের পরিত্যক্ত দেশকে। প্রতি মুহূর্তেই স্থান পরিবর্তন ঘটছে। অর্থাৎ ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তেরও পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বের সমস্ত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে দেশে—যার সাথে কাল বিজড়িত রয়েছে অঙ্গা-

ঙ্গিক ভাবে। অমুক মাসে অমুক দিন সূর্য-গ্রহণরূপ ঘটনাটি ঘটবে' সময়কে বাদ দিয়ে এই আগামী ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভবপর হবে না। হ্যারিসন রোডের উপর একটা য়্যাক্সিডেণ্ট ঘটলো ; এই ঘটনাকে বিবৃত করতে গিয়ে আমরা ইউক্লিডের জ্যামিতির সাহায্যে ঠিক একটা স্থান নির্দেশ করতে পারি ; কিন্তু ঘটনাটির ঠিক পরিচয় দেওয়া যায় না কোন সময় এ ঘটলো তা না জানলে। কোন ঘটনার পরিচয় দিতে হলে স্থানের সঙ্গে কালকে জড়াতে হবে। প্রতি মুহূর্তে আমরা গতিশীল, তথা বিশ্বের সমস্ত বস্তু গতিশীল। দৃশ্যত আমার টেবিলটা এখন স্থির অবস্থায় থাকলেও এই পৃথিবীর গতিবেগে ছুটে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে এর স্থান পবিবর্তন বা পরিবর্তনরূপ ঘটনা ঘটছে ; অর্থাৎ ঘটনার সঙ্গে মুহূর্তের পরিবর্তন হচ্ছে।

অতএব আমাদের দেশ ও কালকে দুইটি বিভিন্ন সত্তা বলে ধারণা করাটা ভুল। কেন না দেশ ও কালের মধ্যে আমাদের ঘটনা ঘটে ও গতিশীল বিশ্বকে দেখতে পাই। শুধু কাল দিয়ে বা শুধু দেশ দিয়ে বস্তুর পরিচয় আমরা দিতে পারি না। প্রত্যেকটি ঘটনারই দেশ এবং কাল দুইটি দিক আছে ; শুধু দেশকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ইউক্লিডের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ দিয়ে। কিন্তু দেশ শুধু দেশ নয়, এ কাল-বিজড়িত। অতএব এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হল দেশ-কাল (space-time), যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-জগৎ এই রূপ অনবরত গতিবেগে ছুটে চলেছে। একে আইনষ্টাইন বর্ণনা করেছেন 'দেশ-কাল-নিরন্তরতা' বলে। ইউক্লিডের তিন পরিমাপক দিয়ে এর পরিচয় দেওয়া যায় না, চতুর্থ পরিমাপক চাই। এই চতুর্থ পরিমাপকই হল কাল।

বিশ্ব গতিশীল বলেই এর অগ্রগতির ছন্দে একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই দেশ-কাল সমন্বিত বিশ্বে দুইটি ঘটনার মধ্যবর্তী

পরিস্থিতিকে আইনষ্টাইন নাম দিয়েছেন আন্তর্বর্তিক বা interval। এর স্বরূপ দেশ-কাল, শুধু কাল নয়।

এই যে আন্তর্বর্তিক, এ সংখ্যার মত পরম বা absolute। যে-কোন গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকার পর্যবেক্ষকের কাছে এ একই।

ট্রেন ছুটে চলেছে; আপনি যাত্রী; জানালার ধারে বসে আছেন। একটা মাইল পোষ্ট থেকে আর একটা মাইল পোষ্ট পার হয়ে গেল ট্রেন। এই দুই মাইল পোষ্টের মাঝখানে যে দেশ-কালের অস্তিত্ব পেলেন, আন্তর্বতিকটা অনেকটা ঐ রকম। একটি অনুপলে গতিশীল পৃথিবী কিছুটা দেশ অতিক্রম করল। সময়-সংবলিত এই দেশই হল আইনষ্টাইনের ইণ্টারভাল; গতিপ্রসূত পরিবর্তনের প্রতি ছন্দেই এই আন্তর্বর্তিক আছে, যত সূক্ষ্মতমই তা হোক না কেন।

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটন একটা আপেলের পতন লক্ষ্য করে ভাবলেন, আপেল পড়ে কেন। তারপর আবিষ্কৃত হ'ল তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। এ কাহিনীটা সবারই জানা আছে।

আইনষ্টাইন কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে ভাবতে সুরু করলেন হঠাৎ নিজেই পপাত হয়ে। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মানুষ। তিনি গিয়েছিলেন দেয়ালের একটা ছবি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে খাটাতে। তাও আবার একটা মইয়ে চড়ে! বাস্ আর কি, হঠাৎ মই থেকে ছটকে গেলেন পডে; পড়ে গিয়ে কোথায় আহা-উঁহু করবেন, না তিনি ভাবতে লাগলেন আচ্ছা সত্যি কি তিনি মাধ্যাকর্ষণের টানে পড়ে গেলেন, না পড়লেন দেশের (space) মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে? তাঁর যেন মনে হল মেঝেটাই লাফিয়ে উঠে তাঁকে আঘাত করল, তিনি ঠিক পড়েননি! গাটা

কিছু ছড়ে গিয়েছিল বটে, যাকৃগে ! স্ত্রীর ব্যাকুলতা দেখে বল্লেন, ও কিছু নয়। তাঁর মাথায় এখন চিন্তা এল সত্যিতো, ব্যাপারটা কি !

....বাস্, চললো বছরের পর মানসিক গবেষণা ও কাগজেপত্রে অঙ্কের খেলা। তারপর কি হল ? না, প্রমাণিত হলো যে নিউটনের পৃথিবীটাই ভুল ! এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে খুলে গেল আরো নূতন আবিষ্কারের পথ।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ভিত্তিতেই তো এই বৈজ্ঞানিক জগৎটা এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল ' মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে আমরা সব উড়ে যেতাম, আপেলও যেতো উর্ধাকাশে উড়ে বা ঐ রকম কিছু হত। পৃথিবীটা শূন্য পথে ছুটতে ছুটতে কোথায় গিয়ে যে ভেঙে পড়ত কে জানে !

হাঁ, অবশ্য নিউটনের আগেও জগৎটা ছিল। তখনও আপেল পড়ত, আমরাও উড়ে যেতাম না ; কিন্তু নিউটনের আগে কি কেউ সমস্ত জগৎটাকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে পেরেছিলেন অতো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ? নক্ষত্র জগৎ, সৌরজগৎ থেকে সুরু করে, যন্ত্রপাতির কারখানায় সর্বত্রই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম খাটছে, দেখতে পাচ্ছি। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই মেঘ আছে, পৃথিবীর টান আছে, সূর্যের টানে বৃষ্টির জল উপরে না উঠে মাটিতেই পড়ছে। যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানের বাইরে একটা রকেট ছুড়ে মারা যেত, তবে তা 'দেশে'র মধ্যে কোন নিরুদ্দেশে ছুটে চলে যেত, কে জানে ! এ হেন মাধ্যাকর্ষণ, যার উপর ইন্‌জিনিয়ারের জগৎ প্রতিষ্ঠিত, আইনষ্টাইন বলেন কি না তা ভুল ! তাইতো ! এই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে এত দিন পর্যন্ত নির্ভুল ভাবে অণুজগৎকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; জগৎ-সৃষ্টির মূলেও পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ—প্রতিটা অণু আকর্ষণ করছে প্রতি অণুকে।

নিউটনের আগে কেপলার। তিনি আবিষ্কার করেছেন সূর্যের চার-দিকে পৃথিবী ঘোরে অক্ষ-পথে। তিনি বলেছিলেন যে একটা 'আত্মা' বা

শক্তির কাজ এই সব—এই পৃথিবীকে সূর্যের আশেপাশে টেনে রাখার কাজ। আরো পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকরা আরো অদ্ভুত ভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যোগাযোগকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু নিউটনের মত এই রূপ চুলচেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি। তাঁর মাধ্যাকর্ষণ গৃহীত হয়েছিল চরম ব্যাখ্যা হিসাবে. অনেক দিন পর আইনষ্টাইন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ভাবতে লাগলেন, নিউটন ঠিক কথা বলেছিলেন কি না!

হাঁ আজও নিউটনের মাপ-জোখে, হিসাবে বা নিয়মে ভুল নেই বলা চলে। তবে নিউটন বলতে পারেননি মাধ্যাকর্ষণ-রূপ ব্যাপারটা ঘটে কেন। মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে প্রায় সব বুঝানো যায় বটে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণটা কি তা বুঝানো মুশকিল।

নিউটনের নিয়ম অনুসারে সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরছে আপনাদের নির্দিষ্ট অক্ষপথে। এই অক্ষপথের নড়চড় হয় না। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের 'টানে' এই পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বুধ গ্রহের ব্যাপার আলাদা। সূর্যের নিকটতম স্থানে ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠিক একই নিকটতম স্থানে এ পুনরায় ঘুরে আসে না। পরের বার এই নিতটতম স্থানের একটু পরিবর্তন ঘটে। এতে করে মনে হয় বুধগ্রহ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম একটু একটু অমান্য করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেভেরিয়ার হিসাব করে দেখিয়েছেন এক শতাব্দীতে যে পার্থক্য ঘটে তার পরিমাণ হল বৃত্তের ৪৩ সেকেণ্ড কোণ। মাধ্যাকর্ষণের হিসাবে সূর্যের টান ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব মিলিয়েও এই পার্থক্য সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন।

ব্যাখ্যা নিয়ে এলেন ৩৬ বছরের বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন। তিনি বললেন, নিউটনের বল (force) কথাটার কোনই অর্থ হয় না। একের আকর্ষণের টানে আর একটি চলে আসে, এই থিয়োরিটাই ভুল। টানাটানির

ব্যাপার বলে কিছু নাই। ওটা খাটে আমাদের ব্যবহারিক জগতে—বৈজ্ঞানিক ভাবে এর মূল্য নেই। আপেলটা মাধ্যাকর্ষণের টানে পড়ে না, সহজ পথ ধরে চলে আসে মাত্র। কোন বস্তু চলতে থাকলে তাকে ঘিরে একটা মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যা চুম্বক-ক্ষেত্রের মত অনেকটা। চুম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে লোহা যেমন সরাসরি ভাবে চলে আসে, তেমনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে পরে আপেল পড়ে মাটিতে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে বলেই গ্রহরা সব ঘূর্ণায়মান।

পৃথিবী ও সূর্যের মত বস্তু-পিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণের ফলে দেশ ও কালের মধ্যে যে প্রভাব পড়ে, তাতে করে দেশের মধ্যে যে সঙ্কোচন বা জড়ানো অবস্থা আসে অথবা যে বক্রতা ঘটে, সে বক্রতা বৃহৎ চলমান বস্তুপিণ্ডের সংস্পর্শে কাছাকাছি জায়গায় বেশ বিস্তৃত হয় এবং আলোড়ন-কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী জায়গায় কম হয়। যেখানে মাধ্যাকর্ষণ প্রবল সেখানে দেশের মধ্যে যেন একটা গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যেন পাহাড় সৃষ্টি হয়। এই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি যেখানে প্রবল, যেখানে চলমান বস্তুপিণ্ডটি বিরাট দেহবিশিষ্ট, সেখানকার কাছাকাছি দেশে বক্রতা সৃষ্টি হয় সব চেয়ে বেশী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই রূপ সৃষ্ট বক্রতা বা 'পাহাড়ে'র অন্ত নাই। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র যত দুর্বল থাকে, সেখানে 'দেশে'র মধ্যে বক্রতা তত কম থাকে; তারপর আরো দুর্বলতর স্থানে দেখা দেয় 'উপত্যকা'। তাই যখন কোন চলমান বস্তুপিণ্ড অন্য একটি বস্তুপিণ্ডের চারদিকে ঘোরে অথবা যখন তাতে এসে পড়ে, তার মানে এই যে এই খানে প্রথম পিণ্ডটি কম বাধায় এসে পৌছেছে। বক্রতা যেখানে পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করে আছে, সে 'পাহাড়' ডিঙাতে বস্তু-পিণ্ডটি চেষ্টা করে না; সহজ বেঁকে যাওয়া পথ অবলম্বন করেই সে চলে,

নদীস্রোত যেমন সমুদ্রের আকর্ষণে ছুটে চলে না, আপন গতিতে এঁকেবেঁকে চলে উঁচু বা কঠিন স্থানে বাধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে, তেমনি।

সূর্যের চারদিকে যে গ্রহগুলি ঘুরছে, তা মাধ্যাকর্ষণের টানে নয়। এদের উপস্থিতিতে যে বক্রতার সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে যে 'পাহাড়' ও 'উপত্যকা'র 'দেশের' বিস্তৃতির মধ্যে, তারই মধ্যে সহজ পথ অবলম্বন করে এরা গড়িয়ে যাচ্ছে মাত্র।

একটি তারা থেকে কোন দর্শক যদি সৌর জগতের ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তো সে দেখবে মাঝখানে সূর্য আছে একটা বিন্দুর মতো আর তার কাছে আসছে আবার দূরে সরে যাচ্ছে গ্রহগুলি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন রাত্রি বেলায় একটা পাহাড়ের মাথায় লাল আলো বসানো হয়েছে। আকাশের খুব উঁচুতে একটা বিমানে বসে আমরা এই লাল আলো দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কিছু নীচুতে কতগুলি সাদা আলো ছুটাছুটি করছে। সাদা আলোগুলি, ধরুন, কতগুলি পুলিসের গাডীর হেড্ লাইট; এই গাড়ীগুলি খুঁজছে একজন পলায়িত কয়েদিকে: পাহাড়টিকে ঘিরে অঁকাবাঁকা অনেক রাস্তা; পুলিসের গাড়ীগুলি ঐ কয়েদিকে ধরবার জন্য রাস্তায়ই ছুটাছুটি করছে। রাস্তাগুলিতেই এই মোটরগুলি চলতে পারে, পাহাড় বেয়ে খাড়া উপরে উঠতে পারে না। এখন রাত্রি বেলাতে বিমানবাহী দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লাল আলো, আর এও দেখছি কতগুলি সাদা সাদা আলো লাল আলোর সামনা-সামনি এসে ফিরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন লাল আলোর কাছাকাছি এসে পড়লে যেন কি রকম রহস্যজনক ভাবে ঐ লাল আলো সাদা অলোগুলিকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আসলে কি ঐ লাল আলো সাদা আলোগুলিকে দূরে সরিয়ে দেয়? না। দিনের বেলাতে বিমানবাহী দর্শক দেখতে পাবে পাহাড়ের উচ্চতার

জন্য এবং রাস্তা নেই বলে পুলিসের গাড়ীগুলি লাল আলোর কাছাকাছি আসতে পারছে না। কিছুটা এসে আবার রাস্তা অনুসরণ করে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ এখানে কাজ করছে না।

দেশ-কালে সৃষ্ট 'উপত্যকা'র পথে সহজ ও সব চেয়ে কম রাস্তারই সন্ধান করে গতিশীল নক্ষত্ররা। যত শীঘ্র যাওয়া যায়, এই ভাব। দুই পরিমাপক বিশিষ্ট একটি সমতলের উপর সব চেয়ে সোজা রাস্তা হলো দুইটি বিন্দুর মধ্যেকার একটি সরল রেখা। কিন্তু যদি কোন বস্তুর উপরিভাগ বক্র হয় কোন বৃত্তের পরিধির রেখার মত, তা' হলে সেখানে সরল রেখাই সব চেয়ে কম রাস্তা হবে না। এই পৃথিবীতো গোলাকৃতি। এখন পানামা থেকে যদি কেউ সিংহল আসে বিমানে চড়ে, তা হলে তার পক্ষে ম্যাপ অনুযায়ী সোজা রাস্তা হওয়া উচিত অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, মধ্য আফ্রিকা অতিক্রম করে, ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে কলম্বো পর্যন্ত টানা পথটি। কিন্তু আসলে এটি তার সোজা পথ নয়। তাকে পানামা থেকে কলম্বো যেতে হলে প্রথমে পার হতে হবে বারমুডা ; তারপর ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ভারতবর্ষ অতিক্রম করে আসতে হবে। এইটেই সোজা পথ। কিন্তু ম্যাপ দেখুন, দেখবেন বিমানটি যেন প্রকাণ্ড বাঁক ঘুরে ঘুরে এসেছে।

পৃথিবীর উপরিভাগটা যেমন সমতল নয়, 'দেশ'ও তেমনি সমতল নয়। জাহাজের কাপ্তেন বা বিমান-চালকের যেমন সব চেয়ে সোজা রাস্তায় পৃথিবী অতিক্রম করতে হলে প্রায় অর্ধেক বৃত্ত ঘুরে যেতে হয়, 'দেশের' পথেও তেমনি বাঁকা পথ অবলম্বন করতে হয় গ্রহ-নক্ষত্রগুলির। আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যা অনুসারে এই আকাশবিহারী বস্তু-পিণ্ডগুলি ছুটে চলেছে দেশ-কাল নিরন্তরতায় (space-time continuam) সৃষ্ট বক্রতার পথে। দেশ, কাল ও মাধ্যকর্ষণের যোগাযোগে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তবে আইনষ্টাইন বলেন, সর্বত্রই এই দেশকালের বক্রতা সমান নয়। বস্তুর পরিমাণ ও বস্তু কি ভাবে ছড়িয়ে আছে, সে হিসাবের উপর বক্রতার স্বরূপ নির্ভর করে। সূর্যের মত ঘনীভূত বস্তুপিণ্ডের সন্নিকটে এই বক্রতার পরিমাণ বেশী। এই জন্য সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকারে গ্রহগুলি ঘূর্ণায়মান! যদি সৌরজগতের বস্তুগুলি ঘনীভূত না হয়ে পাতলা ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতো, তাহলে এই গ্রহগুলির গতি হত সোজা লাইনে।

এতদিন বিজ্ঞান ধারণা করে এসেছিল যে আলোক-রশ্মিও অন্যান্য বস্তুপিণ্ড সোজা লাইনে চলে; তবে বেঁকে যায় শুধু বাইরের শক্তির চাপে বা আকর্ষণে। কিন্তু আইনষ্টাইনের হিসাবে সেটা হওয়া সম্ভবপর নয়। দেশের বক্রতার জন্য আলোক-রশ্মিও বেঁকে যাবে এর চলার পথে যদি সূর্যের মত ভারী বস্তু-পিণ্ডের কাছাকাছি এ আসে বা সৌরজগতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

সূর্যের বস্তু-পরিমাণ কতখানি তার হিসাব জেনে তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন কতখানি বক্রতা সৃষ্টি হয় সূর্যের আশেপাশে দেশের মধ্যে; এবং এই বক্রতার সাথে সমতা রাখতে গিয়ে আলোক-রশ্মিও কতটা বেঁকে যাবে তা তিনি কাগজপত্রে হিসাব করে দেখিয়েছেন। এই ভাবে তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন বুধ গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরতে গিয়ে নিউটনের নিয়ম অনুসরণ করে না কেন; এবং চুলচেরা অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, বুধ গ্রহের গতিপথের বিচ্যুতির পরিমাণ। তাঁর এই গাণিতিক হিসাব প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনষ্টাইনের এই আবিষ্কার তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব', বা General Theory of Relativity-র অন্তর্গত।

এর পরে তিনি ঘোষণা করেন যে বস্তুর ঝোঁক বা inertia এবং মাধ্যাকর্ষণ—এরা পরস্পর আনুপাতিক সম্বন্ধযুক্ত নয়; ঝোঁক ও মাধ্যাকর্ষণ

একই এবং অভিন্ন। নিউটনের থিয়োরী অনুসারে এদের মধ্যে পার্থক্য তো ছিলই, পরন্তু এই দুয়ের একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ খাড়া করে বিজ্ঞান-জগতের কাজও চলে যাচ্ছিল সুশৃঙ্খল ভাবে। আইনষ্টাইনের মতে ঝোঁক ও মাধ্যাকর্ষণ—দুইই বস্তুর বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। এই আবিষ্কারের ফলে মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তা' নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, তথা এতদিনের প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে দেয়। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

ক্রমবেগ বা (acceleration) হলো এই নূতন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মূল কথা। আইনষ্টাইনে মতে ক্রমবেগ মানে শুধু বস্তুর গতিবৃদ্ধির ও গতি হ্রাসের হিসাব নয়, গতির যে কোন পরিবর্তন মানেই এই। যে কোনো দিকে বস্তু গতিশীল হবার সময় যে পরিবর্তন হয়, তাকেও ক্রমবেগ বা acceleration দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। একটা মোটর গাড়ীর গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ২০ মাইল থেকে ৫০ মাইলে বৃদ্ধি পায়, অথবা একটা ট্রেন ৬০ মাইল বেগে চলতে চলতে যদি ক্রমশঃ মন্থর গতিতে ২০ মাইল বেগে চলতে থাকে, অথবা একটা বিমান যদি উত্তরমুখী চলতে চলতে পূর্বমুখী চলতে আরম্ভ করে, তাহলে এই সবগুলিই ক্রমবেগ-ঘটিত ব্যাপার, বুঝতে হবে। আইনষ্টাইন দেখতে পান এই ক্রমবেগ এবং নিউটনের তথাকথিত মাধ্যাকর্ষণ পরস্পর সমান।

নিউটনীয় বিজ্ঞান অনুসারে আমরা জানি যে পতনশীল বস্তুর উপর দুটা শক্তি কাজ করে। একটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ আর একটি হচ্ছে আহ্নিক গতিতে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মাঝে গড়ে উঠা কেন্দ্রাতিগ শক্তি। ঝোঁক-বিশিষ্ট বস্তুর একটা বিশেষ পরিচয় হলো এই কেন্দ্রাতিগ দিকটা। অর্থাৎ এই অবস্থায় বস্তু যখন স্থির থাকে, তখন স্থিরই থাকে; আবার

যখন চলতে থাকে, তখন চলাই হয় তার ধর্ম। বস্তুর এই ধর্ম থাকাতে বস্তুটি হয় স্থির থাকবে, নয় একই গতিতে চলতে থাকবে। এর পরিবর্তন ঘটবে যদি বাইরের আর একটি বস্তুর সংঘাতে এ পড়ে বা সংস্পর্শে আসে। এইরূপ সংঘাত বা সংস্পর্শে এলে বস্তুটির মধ্যে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরুন একটা রেলগাড়ী চলছে সমান গতিতে। এই গতিশীল অবস্থায় গাড়ীটি এখন interia-সম্পন্ন বা এক ঝোঁকে চলেছে। হঠাৎ যদি ড্রাইভারটি গাড়ীর ব্রেক কষে দেয়, তাহলে কি অবস্থা হয় বলুন? য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ হতে পারে, নয় কি? হঠাৎ ব্রেক কষায় গাড়ীর intertia বাধাগ্রস্ত হল; ফলে ভীষণ ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। গাড়ীর ভিতরকার যাত্রীরা চুপচাপ বসে থাকলেও গতিসম্পন্ন ভাবে inertia নিয়ে ছিল। অকস্মাৎ বাধা পাওয়ায় গাড়ীর মধ্যেই তারা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল তারা তাদের inertia-তে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ বেগের জন্য। এই কেন্দ্রাতিগ বেগ আর মাধ্যাকর্ষণ—এই দুইয়ের জন্য পৃথিবীর অন্তর্গত বস্তুগুলির ওজন নির্ণীত হয়। ফল মাটিতে পড়ে এই জন্য যে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ বেগের তুলনায় তার আহ্নিক গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ধীর। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের একটা সামান্য অংশ মাত্র বিচলিত হয় এই কেন্দ্রাতিগ বেগের জন্য। যদি এই গ্রহের আহ্নিক গতিবেগ বর্তমান গতিবেগের ১৭ গুণ বেশী হত, তা হলে পৃথিবীর inertia-র ফলে উৎপন্ন এই পৃথিবীরই বিষুবরেখায় যে কেন্দ্রাতিগ বেগ সৃষ্ট হত তাতে করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সমতা রক্ষিত হত। এই কেন্দ্রাতিগ বেগ ও মাধ্যাকর্ষণের এই পারস্পরিক সাম্যের ফলে যে অবস্থা দাঁড়াত, তাতে করে গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ত না, পড়ত মেরুরেখার সমান্তরালে। পৃথিবীর আহ্নিক গতিবেগ যদি আরো

বেশী হত তা'হলে সমস্ত 'পতনশীল' বস্তু ছুটতো ঊর্ধ্বমুখে, পৃথিবীর মেরুরেখা থেকে লম্ববান ভাবে।

কোনো বস্তু ওজন করা মানেই হচ্ছে তার মাধ্যাকর্ষণের পরিমাপ করা। কিন্তু দেখা যায় এই ওজনও আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত। বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গার জিনিসটার ওজন যা হবে, উত্তর মেরুর কাছাকাছি জায়গায় তার ওজন হবে অপেক্ষাকৃত বেশী। পৃথিবীর উপরিভাগে একটা জিনিসের ওজন যা হবে,পৃথিবীর অভ্যন্তরে সে জিনিসটার ওজন হবে কম। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে বিষুবরেখাতে কেন্দ্রাতিগ বেগের প্রভাব সব চেয়ে বেশী পড়ে; কেন না, বিষুবরেখাতেই পৃথিবী সব চেয়ে বেশী আহ্নিক গতিতে ঘূর্ণায়মান। ওদিকে মেরুদেশের কাছে এই ঘূর্ণায়মানতার পরিমাণ কম। জিনিসের ওজন মানে হল জিনিসটির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের পরিমাণ। এখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটা জিনিস নিয়ে গেলে তার ওজন কমবে এই জন্যে যে পৃথিবীর উপরিভাগের একটা বৃহৎ অংশের মাধ্যাকর্ষণ হতে এই জিনিসটি কিছুটা বঞ্চিত হবে। জিনিসের উপর মাধ্যাকর্ষণের এই যে প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তা কম বেশী হবে। ফলে জিনিসের ওজনও কম বেশী হবে।

মাধ্যাকর্ষণের এই আপেক্ষিকতা শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়; মাধ্যাকর্ষণ সর্বত্রই আপেক্ষিক। বস্তুর অবয়ব, ঘনত্ব ও ক্রমবেগের উপর মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে। এই পৃথিবী গ্রহে আপনার ওজন যদি হয় ১২০ পাউণ্ড, বৃহস্পতি গ্রহে (Jupiter) আপনি হয়ে যাবেন ৩০০ পাউণ্ড। বৃহস্পতি গ্রহ ১,৪০০টা পৃথিবীর মত বস্তু সম্পন্ন। এর মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণের ২½গুণ বেশী। অতএব আপনার ওজনও যে অতটা পরিমাণে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! এবার আসুন

চন্দ্র উপগ্রহে। এর অবয়ব ও বস্তু-পরিমাণ এত অল্প যে, এখানে আসতেই আপনার ওজন কমে যাবে আপনার পৃথিবীতে থাকা-কালীন ওজনের প্রায় ছয় ভাগ। অর্থাৎ আপনি হবেন ২০ পাউণ্ড ওজন সম্পন্ন। কিন্তু এই চাঁদেও যদি আপনি তীব্র গতিতে ছুটতে পারেন তবে আপনার ওজন অতো কমবে না। বস্তুর ওজন বেড়ে যায় এর গতিবেগ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে। আপনি ধরুন সেকেণ্ডে ১০০ মাইল বেগে ঊর্ধমুখে ছুটে চলবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তার মানেই হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ খুব প্রবল না হলে আপনি মাটির দিকে নেমে আসবেন না। মাধ্যাকর্ষণ হল ওজনের পরিমাপক। আপনার উপর প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ আরোপ করার মানে হইল আপনার ওজন বৃদ্ধি হতে দেওয়া।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওজন, গতিবেগ,মাধ্যাকর্ষণ—সবগুলিই আপেক্ষিক; স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবর্তন হয়। এই বিভিন্ন অবস্থাগুলি যে পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত তাও আমরা বুঝতে পারছি। আইনষ্টাইন এই কথাই বলেন। তিনি বলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও ক্রমবেগের বা পরিবর্তনমুখিনতার মধ্যে তাই কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই রূপে আইনষ্টাইনের পারস্পরিক সম-মূল্যতা বাদ (Law of Equivalence) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে সৃষ্ট মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র ক্রমগতি-বেগের ফলে উৎপন্ন কৃত্রিম ক্ষেত্রের সম পরিমাণযুক্ত সমস্ত দিক দিয়ে। এই জন্য কোন পরীক্ষার সাহায্যেই এদের মধ্যে পার্থক্য দেখান সম্ভবপর হয় না।

অর্থাৎ দৃশ্যত মাধ্যাকর্ষণের যে শক্তি বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার সৃষ্টি হয় ক্রমবেগের জন্য। এর থেকে এই বস্তুর

বস্তু-পরিমাণ (mass) নির্ণীত হয় সেই শক্তির পরিমাণ দ্বারা, যার পরিমাণ ক্রমবেগের পরিমাণের স্বরূপ।

একটা বস্তু যত বস্তু-পরিমাণযুক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ হবে, এর গতিবেগের পরিবর্তন সাধনের জন্য তত বেশীই শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। অপর দিক থেকে ধরুন, দশটা ওয়াগনযুক্ত একটা মালগাড়ীকে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে চালান যেতে পারে একটা সাধারণ ইঞ্জিনের সাহায্যে। ঠিক এই সমান গতিতে বিশটা ওয়াগনযুক্ত গাড়ীকে চালাতে হলে যে ইঞ্জিনের দরকার হবে, তার শক্তি হওয়া চাই পূর্বোক্ত ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক বেশী। তা' হলেই দেখতে পাচ্ছি, যদি দুই ক্ষেত্রেই ইঞ্জিন দুটি সমান শক্তিসম্পন্ন হত গাঁড়ী-দুটির গতিবেগেরও বেশ তারতম্য ঘটতো। যদি বস্তু-পরিমাণ বেশী হয়, তবে বস্তুর গতি-বেগও সেই পরিমাণ কম হয়, এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। গাণিতিক হিসাব দিয়ে আইনষ্টাইন তাই দেখিয়েছেন। এই রূপে বস্তুপিণ্ডের বস্তু-পরিমাণ হিসাব করে বের করা যেতে পারে। দুইটি ভিন্ন অথচ স্থির বস্তুর উপর যদি একই রকমের শক্তির প্রয়োগ করা হয় এবং তখন যদি দেখা যায় প্রথম বস্তুটির গতিবেগ দ্বিতীয় বস্তুটির গতিবেগের দ্বিগুণ, তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্ত পৌঁছি যে প্রথম বস্তুটির বস্তু-পরিমাণ দ্বিতীয় বস্তুটির দুই ভাগ কম। এত দিন বস্তু-পরিমাণকে বস্তুর ধর্ম বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল এবং এই বস্তু-পরিমাণ অপরিবর্তনীয় বলেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আইনষ্টাইনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে বস্তু-পরিমাণ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে আপেক্ষিক। দেশ ও কালের মধ্যে গতিবেগের বিভিন্নতা ও পরিবর্তনের জন্য বস্তুও পরিবর্তন শীল।

এর পরে আইনষ্টাইন আবার বলেছেন, যে কোনো গতিশীল

বস্তুপিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের স্বরূপটাও নির্ণীত হয় 'দেশে'র মধ্যে ঐ বস্তুপিণ্ডের অবস্থানের উপর।

গ্যালেলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে যদি কোন উচ্চ স্থান হতে একটি ভারী ও একটি পাতলা জিনিস একই সময়ে নীচে ফেলা যায়, (পথে যদি বাতাস বা অন্য কোন বাধা না থাকে) তা হলে দুটো জিনিস একই সময় ভূমিতে পড়বে; দুটিরই পড়ার বেগ হবে সমান। সৌরজগতেও দেখা যায় অতিশয় পাতলা ধূমকেতু আর বিপুল বস্তু-সমন্বিত গ্রহ একই ক্রমবেগে বা acceleration-এ ঘোরে, যদিও এরা দুটিই সূর্য থেকে সমদূরত্বে থাকে। আইনষ্টাইন এর ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে সমস্ত বস্তুপিণ্ড একই মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে একই প্রকার ব্যবহার করে। একটি বস্তুপিণ্ডের উপর মাধ্যাকর্ষণের ফলে যে শক্তির প্রয়োগ হয়, তা নির্ভর করে বস্তুটির অবস্থানের উপর। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের পরিমাণ, তথা বস্তুটির ওজনের পরিমাণ তাই স্বাভাবিক নয়, আপেক্ষিক।

ধরুন, বাক্সের আকৃতির মত একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে অনেকগুলি লোক জমেছে। এই বাক্সটা যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে উপর থেকে বাধা-হীন ভাবে নীচে পড়তে থাকে, তা হলে ভিতরকার কোন ব্যক্তিই বুঝতে পারবে না বাক্সটি সত্যিই পড়ছে কি না! বাক্সটি চলছে কি না, তা এরা বুঝতে পারত যদি বাইরের কোন দৃশ্যবস্তুর সাথে মিলিয়ে এর গতির হিসাব পাওয়া যেত। মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব তাই তাদের কাছে থাকবে না।

এখন এই বাক্সবন্দী একটি লোকের হাত থেকে যদি রুমালটি খসে যায়, তবে তা বাক্সের তলায় পড়বে না, স্থির হয়ে থাকবে লোকটির হাতের সামনে। কিন্তু যদি লোকটি জোর করে রুমালটিকে নীচে ...

ফেলতে চায়, তবে তাতে সমর্থ হবে। যদি বাক্সটির মাথার দিকে একটা মুখে দড়ি বেঁধে ভিতরকার লোকগুলি অনবরত টানাটানি করতে থাকে, তা হলে এই জোর প্রয়োগের ফলে সমস্ত জিনিসটার গতি ব্যহত হবে। এই ব্যহত হওয়ার জন্য ভিতরকার লোকেরা বুঝতে পারবে মাধ্যাকর্ষণের 'টান'। কেন না, এতক্ষণ তারা না জানলেও বাক্সটা স্বাধীন ভাবে ছুটে চলেছিল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে।

খুব দ্রুত লিফ্‌টে উপরে উঠতে থাকলে লিফ্‌টের আরোহী স্পষ্টত এই 'টান' বুঝতে পারে। তার মনে হয় যেন তার পা দুটা লিফ্‌টের মেঝেতে চেপে বসেছে। লিফ্‌টটা দ্রুত নামবার সময় সে অনুভব করবে মেঝে থেকে যেন তার পা আলগা হয়ে আসছে।

লিফ্‌টে উঠবার সময় তার ওজন বেড়ে যায়, নামবার সময় যায় কমে। যদি মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণের অনুযায়ী ক্রমবেগে তার লিফ্‌ট্ উপরে উঠতে থাকে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে যদি লিফ্‌ট্টার ক্রমবেগ ৩২ ফিট করে বেড়ে যায়, তা হলে আরোহীটির ওজন বেড়ে গিয়ে ডবল হয়ে যাবে। আবার যদি ঐ রূপ ক্রমবেগেই লিফ্‌ট্টা নামতে থাকে, লোকটি একদম ওজনশূন্য হয়ে যাবে। ক্রমবেগ, মাধ্যাকর্ষণ ও ঝোঁক—এই তিনের যোগাযোগ ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে লোকটির ওজন বাড়বে বা কমবে। এই ওজন বাড়া-কমার মানেই হল যাতে আমরা বাহিত—বাক্স, লিফ্‌ট্, বা পৃথিবী, তাদের মাধ্যাকর্ষণের বৃদ্ধি বা হ্রাস। মনে রাখতে হবে মাধ্যাকর্ষণ স্বাভাবিক নয়, আপেক্ষিক।

আসলে মাধ্যাকর্ষণের কোন অস্তিত্বই নেই। এই ক্রমবেগ, গতি, মাধ্যাকর্ষণ, ঝোঁক, বস্তু-পরিমাণ—এগুলি সবই আপেক্ষিক এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। স্বাধীন ভাবে এগুলির কোনটারই অস্তিত্ব নেই। শক্তি

বা energy-ও এই দলভুক্ত। আইনষ্টাইন আরো বলেছেন যে শক্তি ও বস্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানা যায় না। আসলে এরা এক। শক্তি এর চরম ঘনীভূত অবস্থায় বস্তু রূপে পরিণত হয়। শক্তিকে বস্তুতে পরিণত করা, এবং বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা তো যায়ই; তারপর 'ধর্মের দিক থেকেও এদের মধ্যে পার্থক্য নেই। বস্তুর মত শক্তিও সমান চুম্বকচাপ দিতে সমর্থ। কোন একটি পদার্থ যদি শক্তি সম্পন্ন হয়, তা হলে এর বস্তুও বেড়ে যাবে। কোন পদার্থের শক্তি ক্ষয় হতে থাকলে এর বস্তু-পরিমাণও কমে যাবে।

বিশ্বজগৎ বৈজ্ঞানিকদের কাছে এতদিন অসীম বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু আইনষ্টাইনের 'দেশের বক্রতা' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বজগৎটাকে এখন সিলিণ্ডারের মত বলে ধারণা করা যাচ্ছে যুক্তিসংগত ভাবে। দেশের সীমা নেই, প্রান্ত নেই, যেমন একটা ডিমের সীমা বা প্রান্তরেখা বলতে কিছু নেই। কিন্তু তবু বিশ্ব পরিসীম, যতো বৃহৎই হোক না কেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমাদের দেশের দার্শনিকরা কিন্তু কয়েক হাজার বছর আগেও বিশ্বকে অণ্ডাকৃতি বলে কল্পনা করেছিলেন।

যদি এই বিশ্বে শুধু দেশই থাকতো, বস্তু থাকতো না, তা হলে এজগৎ অসীমই হতো। এর থাকতো অপরিসীম বিস্তৃতি, থাকতো না এতে 'বক্রতা'। কিন্তু বস্তুর বর্তমানতায় মাধ্যাকর্ষণের জন্য দেশে যে বক্রতার সৃষ্টি হয়, আইনষ্টাইনের থিয়োরী অনুসারে সেই বক্রতার জন্য এই বিশ্বও বক্রতা প্রাপ্ত হয়!

এখন অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে দেখান যাচ্ছে বিশ্বের আকৃতি সিলিণ্ডারের মত; এবং এর আকার-প্রকার হিসাব করে নির্ণয় করা গেছে। আকার ও প্রকার জানা গেলে পরিমাণও জানা অসুবিধা হয় না বৈজ্ঞানিকের

কাছে। একটি বিশেষ আকারের বিশ্বে নিশ্চয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বস্তু থাকবে যদি তার এই আকার বজায় রাখতে হয়। বস্তু ও দেশের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাতে করে একটাকে দিয়ে আর একটার পরিবর্তন বেশ বুঝতে পারা যায়। যেমন জুতোর ভিতরকার ফাঁকের ব্যাস নিয়ে পায়ের ব্যাস ঠিক করা যায়।

স্যার জেম্‌স্ জিন্ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে যদি দেশের সর্বত্র বস্তু সম ভাবে ছড়িয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বের সমগ্র বস্তুর পরিমাণ দাঁড়াবে এই বিশ্বেরই ব্যাসার্ধের অনুপাতের অনুযায়ী। বস্তুর ঘনতা অনুসারে এই অনুপাতের কমবেশী হবে।

অতিশয় বৃহৎ বিশ্বে যে বস্তু বিস্তৃত থাকবে তা থাকবে পাতলা পাতলা ভাবে ছড়িয়ে। বস্তু যত ঘন হবে বিশ্বের আকৃতি ততোই ছোট হবে। এই বিশ্ব কেন্দ্রহীন। বিশ্ব গোলাকৃতিও নয়, ডিম্বাকৃতিও নয়, সিলিণ্ডারের মত করে এ গঠিত।

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করে দেখিয়েছেন যে বিশ্বের ব্যাসের দৈর্ঘ্য (diameter) ৬ ট্রিলিয়ন আলোক-বৎসরের চেয়েও বেশী লম্বা! এই বিশ্বে আছে ৬০০ নীহারিকা বা ছায়াপথ (galaxies); প্রত্যেকটি নক্ষত্র তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের চেয়ে ৮০ মিলিয়ন গুণ বেশী জ্যোতি এবং ৫০০ মিলিয়ন বস্তু-পরিমাণ সম্পন্ন! এই বিশ্বরূপের পরিচয় ও উপরোক্ত হিসাব দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের ভিত্তির উপর।

আইনষ্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে দেশকাল ও মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রকে একই পর্যায়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। তবে মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র ও ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ক্ষেত্রের মধ্যে যে পার্থক্য থেকে যাচ্ছিল, তার কিছুটা দূরীভূত করেন মাত্র ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষিত একক্রত

ক্ষেত্র বা Unified Field থিয়োরী দিয়ে। অন্তত দুইটি জায়গায় ইলেকৃট্রো-মেগনেটিক ক্ষেত্রকে আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে তিনি বুঝাতে সমর্থন হয়েছেন মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের সাথে মিলিয়ে। একই গাণিতিক হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ ও ইলেকৃট্রো-ম্যাগনেটিজম্‌কে বুঝাতে তিনি প্রচেষ্টাবান রয়েছেন এই নূতন থিয়োরী অনুসারে এবং কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছেন।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব জগতের প্রায় সমস্ত কিছু বুঝানো সম্ভবপর হলেও এই রকম দুই একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন গবেষণা করছেন এই সামান্য পার্থক্য-গুলিকে নিরাকরণ করবার জন্য।

বর্তমান রচনায় আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানের প্রধান কয়েকটি বিষয়ের সামান্য পরিচয় দেওয়া হল মাত্র। তাঁর ব্যাপক আপেক্ষিক তত্ত্বের আওতায় আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যার উল্লেখ করাও এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য, আমরা শুধু আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের আভাস তথা আংশিক পরিচয় দেওয়াটা এখানে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আইনষ্টাইনের বিজ্ঞানকে পুরাপুরি বুঝাতে হলে যে অঙ্কশাস্ত্রীর জ্ঞান থাকা দরকার, সে জ্ঞানের অধিকারী গুটিকয়েক ব্যক্তি মাত্র। আইনষ্টাইনই একবার বলেছিলেন যে মাত্র বারো জন লোক তার বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। কিন্তু তাহলেও আইনষ্টাইনের আবিষ্কার নিয়ে কম পক্ষে বারো হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গাণিতিক গভীরতায় অনেকে পৌঁছাতে না পারলেও আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের ব্যাখ্যায় যে যুক্তি ও দর্শনের দিক আছে, তা সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের

বোধগম্য। তবু এই যুক্তি ও দর্শনের দিকটাও একটা ছোট অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ ভাবে আলোচনা করা গেল না। তবে যতটুকু আলোচনা করা গেল আইনষ্টাইনের জীবন কাহিনী বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

আদর্শবাদ

রবীন্দ্রনাথ যেমন শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন স্রষ্টা ও দার্শনিক, আইনষ্টাইন তেমনি শুধু বৈজ্ঞানিক নন, তিনিও তাঁর মতই একজন স্রষ্টা ও দার্শনিক। মানবতা এই উভয়েরই জীবন-দর্শন। তাঁদের চিন্তা-ধারার মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও পার্থক্য আছে; কিন্তু আসল মিল রয়েছে তাঁদের বিশ্বপ্রাণতায়। এইখানেই তাঁদের মনীষা। প্রতিভা তাঁদের প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে ও বিজ্ঞানে; কিন্তু তাঁদের উভয়ের মনীষা প্রকাশ পেয়েছে মতে ও আদর্শে। রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন এই আদর্শের ভিত্তিতে একই আসনে সমাসীন। এই দুইজনের এক সঙ্গে তোলা ফটো হয়তো অনেকে দেখেছেন। পাশাপাশি বসে আছেন তাঁরা একই কুশানের উপর—এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও এযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু এই পার্থক্যগত পরিচয়টাই সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। যে গভীরতম দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও কাব্য পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দেখতে হবে বিশ্ব-মানবতার এই দুই প্রতীককে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কবিকে নয়, বৈজ্ঞানিককে নয়।

আইনষ্টাইন আদর্শের দিক থেকে এই বিশ্বমানবতার দার্শনিক। তাঁর বিজ্ঞানও এই বিশ্বমানবতাকে বিকশিত করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে তাঁর সমগ্র কার্য-কলাপের মধ্যে, লেখা ও বক্তৃতায় এই ভাবই ফুটে উঠেছে বারংবার। তাঁর শান্তিবাদ ও আন্ত-র্জাতিকতা এই আদর্শেরই রাজনৈতিক দিক।

রাজনৈতিক ভাবে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ব্যক্তি স্বাধীনতার,

সব চেয়ে বেশী বিকাশের সুযোগ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আওতায় পাওয়া যায়, তিনি ঐ রূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন ঃ

'আমার রাজনৈতিক আদর্শ হলো গণতন্ত্র ; প্রত্যেকটি ব্যক্তিই এই রূপ রাষ্ট্রে সম্মানিত হোক ; কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে মাথায় তুলে নেবার কোন মানে হয় না।'

তবে দার্শনিক ভাবে তিনি মানুষের স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করেন না।

'দার্শনিক ভাবে মানবীয় স্বাধীনতার আদর্শে আমি স্পষ্টতই বিশ্বাস-বান নই ; প্রত্যেকটি লোকই শুধু বাইরের চাপে পড়েই কর্মে নিযুক্ত হয় না, তাদের অন্তরের গভীর তাগিদেও তারা কর্মপ্রবণ হয়।'

কি এই তাগিদ....বাইরের কি এই চাপ ? মূলে তিনি দেখতে পেয়েছেন পরিব্যাপ্ত বিশ্বজনিনতা যেখানে প্রত্যেকটি ভিন্ন মানুষই পরস্পরের সঙ্গে শুধু গভীর যোগসূত্রে গ্রথিত নয়, প্রত্যেকের জীবন ও কার্যকলাপ পরস্পরের প্রতি ঘাতপ্রতিঘাতে একটা বিপুল বিশ্বজীবনধারার প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

'যখন আমরা আমাদের ধারা ও প্রচেষ্টাগুলিকে বিচার করে দেখি, আমাদের বুঝতে আর বিলম্ব হয় না যে আমাদের প্রায় সমস্ত কর্ম ও আকাঙ্খা অন্য মানুষের অস্তিত্বের সাথে বাঁধা হয়ে আছে। আমরা দেখতে পাই আমাদের সমগ্র প্রকৃতি যেন একটা সামাজিক জীবের অনুরূপ।'

এই ভাবে একটা বন্ধনের আওতায় সমগ্র বিশ্বমানব ধৃত থাকলেও ব্যক্তির চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। মানুষ স্রষ্টাও। সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশে তাদের চিন্তাব ও কর্মের দান অনেকখানি। সমাজ-জীবনে এই মানব-সৃষ্ট সৃষ্টি-রূপকে আমরা প্রকট ভাবে দেখতে পাই। তিনি

বলেন, 'শুধু ব্যক্তিই পারে চিন্তা করতে; এই রূপে তারা সমাজের জন্য সৃষ্টি করে নূতন অবস্থাকে, নূতন মূল্য দেয় সমাজের; শুধু তাই নয়, নূতন নৈতিক মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হয় তার কর্মের মধ্য দিয়ে, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নূতন সমাজ জীবন। যদি এই রূপ সৃষ্টি-উন্মুখ স্বাধীন চিন্তাশীল এবং বিচারক্ষম ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটতো, তাহলে সমাজের ঊর্ধমুখিন বিকাশের কথা আমরা কল্পনা করতে পারতাম না—যেমন কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কথা চিন্তা করতে পারতাম না, যদি তা সমাজের উর্বরতার মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করবার সুযোগ না পেত;

'এই রূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট লোকের সংখ্যা জনসমাজে খুবই অল্প। এই ব্যক্তি-বিশেষদের সৃষ্টিমূলক দানের মধ্য দিয়ে সমাজ বা সংঘগুলি মনীষীদের স্থান অধিকার করেছে কিছুটা; বিশেষ করে শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। নিছক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর বেশ একটা স্পষ্ট আভাসও পাওয়া যাচ্ছে।'

এই ভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। শুধু স্বীকার নয়, এর উপর জোরও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব হলো সৃষ্টি-পথের অগ্রদূত, নায়ক নয়, সর্বাধিনায়ক তো নয়ই। জনতা ও জন-সমাজকে পথ দেখিয়ে নেবে এরা জনতার অঙ্গ হিসাবেই; প্রভুত্বের অধিকারের দাবী এরা করবে না; সমাজবিকাশের পথ এরা রুদ্ধ করবেন না রাজনীতি বা প্রগতি-বিরোধী অন্যান্য নীতির সাহায্যে।

বিরাট ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচায়ক। আজকের সমাজ জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার জন্য তিনি কিছুটা দায়ী করেছেন আধুনিক শিল্প ও কলকারখানাগুলিকে। তিনি বলেছেন:

'আমার মতে এযুগে যে ধ্বংসমুখিনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার

ব্যাখ্যা করা যায় এই তথ্য দিয়ে যে শিল্পের ও কলকারখানার উন্নতি মানুষের জীবন-সংগ্রামকে আগের চেয়েও কঠিন করে তুলেছে, যার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশের পথ ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেকখানি।'

তবে তিনি এই যান্ত্রিক প্রগতির মধ্যে আশার আলোও দেখতে পেয়েছেন। এই যান্ত্রিক জীবনের ক্রম-উন্নতির ফলে মানুষকে হাতে-কলমে অনেক কম খাটতে হবে সামাজিক দাবী মিটানোর জন্য। তিনি তাই বলছেন :—

'এখন সব চেয়ে বড় দরকার হল একটা পরিকল্পিত উপায়ে শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করা। এই রূপ বিভাগ হলে ব্যক্তি হবে তার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠা বা জীবনের নিরাপত্তা, লব্ধ সময় ও তার নিজস্বতা, যা তার নিজেরই আওতায় আসবে এখন, তার সাহায্যে ব্যক্তি-জীবনের আরো উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করতে পারবে সে।

শিল্প-জীবন যদি ব্যক্তিকে এই মুক্তির সুযোগ না দেয়, তাহলে সভ্যতার এই ক্রম-অধোগতিকে বাধা দেওয়ার কোন পথ খোলা থাকবে না বলে তিনি আশঙ্কা করেন। এই জন্য তিনি শিল্পজীবনের বর্তমান কাঠামোটারও আমূল পরিবর্তনের স্বপক্ষে মত দিয়েছেন।

এই যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে আজকের জীবনে, অতীতের সঙ্কটগুলির সাথে এর একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে গেছে। আজকের সঙ্কট দেখা দিয়েছে একটা নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনের উপায়-ব্যবস্থায় অতি দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকাতে। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে হলে উৎপাদনের এই দ্রুত পন্থারও অবসান আনা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আজকের এই যান্ত্রিক সমাজ-জীবনকে প্রশ্রয় দেবার জন্য এবং এই জীবনকে প্রাধান্য দেবার জন্য দায়ী করেন রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রই

সমাজকে এই ভাবে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ দিচ্ছে আপনার অধিকার বজায় রাখবার জন্য। এই সময় রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল যান্ত্রিকতার নাগপাশ হতে ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থা করা। তা না করে এ এর রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে আরো দৃঢ় ভাবে বাঁধিতে চাইছে মানুষকে।

তিনি বলেন, রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে মানুষের জন্য, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য সৃষ্টি হয় নাই; মানুষের জন্যই আজকের রাষ্ট্রের রূপ হওয়া চাই ব্যক্তিতান্ত্রিক। রাষ্ট্রকে ব্যক্তি নিয়োজিত করবে সমাজ জীবনের ক্রম-উন্নতির পথে। যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক হবে এই রাষ্ট্রের গঠন।

তিনি মার্কস্ ও টলষ্টয়ের মত রাষ্ট্রহীন ভবিষ্যৎ সমাজের কল্পনা করেন না। যদিও একক বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বরঞ্চ তিনি খুশী হতেন। তবে রাষ্ট্র জাতীয় হোক বা আন্তর্জাতিকই হোক, অধিকার মূলক দাবী নিয়ে তার আসা উচিত নয় মানুষের কাছে।

আইনষ্টাইন স্বভাবতই জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী নন। আন্তর্জাতিক-তাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র। শুধু মনীষী হিসাবে নয়, ইহুদী বংশে তাঁর জন্ম বলে আন্তর্জাতিকতা তার শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে মিশ্রিত। ইহুদীরা সব দেশেই বিদেশী বলে গণ্য হয়। ঐ সব দেশের নাগরিক অধিকার প্রায়ই তাদের থাকে না, বহুশতাব্দী ধরে তারা ঐ সব দেশে বাস করলেও।

আইনষ্টাইন বাল্যকালেই অনুভব করেছিলেন জার্মানীতে জন্মলাভ করলেও এবং জার্মানী তাঁর কথ্যভাষা হলেও জার্মানীকে তিনি আপন দেশ বলে দাবী করতে পারেন না, নিজের অন্তরের দিক থেকেও নয়। তাই তিনি তরুণ জীবনেই একবার সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক জীবন গ্রহণ করেন। আবার তিনি নিজেকে জার্মান বলে পরিচয় দেন জার্মান নাগরিকতা গ্রহণ করে। এখন তিনি আমেরিকান এবং সরকারীভাবে

তাঁর এই পরিচয় স্বীকৃত। অবশ্য এই রক্তের দিক ছাড়াও তিনি মনীষার যে উচ্চস্তরে অবস্থিত, সেখানে জাতীয়তার সীমারেখা টানা যায় না। তিনিও তা চান না। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিকতার আদর্শবাদী।

কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ইহুদী জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণের দাবীতে প্যালেষ্টাইনকে কেন্দ্র করে ইহুদী জাতীয়তা গড়ে উঠবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেই বলেছেন যে একটা 'বিশেষ ক্ষেত্র'। তাঁর মূল আন্তর্জাতিক আদর্শকে এ ব্যহত করেনি। ব্যক্তি এবং একটি সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে এই রূপ জাতিগত সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন থাকতে পারে সাময়িক ভাবে। জাতীয়তার গণ্ডির দাগ থাকবে না এখানে।

কিন্তু এই শুভ দিন আসবে কি ভাবে, এইটেই হলো প্রশ্ন। আইনষ্টাইন অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করে দেননি। করবার কথাও নয়। কেন না আসলে রাজনীতিক তিনি নন। তাঁর আদর্শবাদ চায় আন্তর্জাতিকতা। রাজনীতিকদের এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি মনে করেন যে বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ যদি সংঘবদ্ধ ভাবে আন্তর্জাতিকতার পথে কিছু কাজ করেন, তা' হলে তার প্রভাব রাজনৈতিক জীবনেও কিছু কিছু পড়বে বৈ কি ?

এই সম্বন্ধে তিনি ডাক্তার সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েডকে যে চিঠি লেখেন, তার থেকে কিছু উধৃত করে দিচ্ছি এইখানে ঃ

'এ যুগের নেশনগুলির ইতিহাসে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রভাব সোজাসুজি পড়ছে না; তাঁদের এই সংহতির অভাবের জন্য তাঁরা মুখ্য ভাবে আজকের সমস্যাগুলির সমাধানের ভার নিতে পারছেন

না। আপনি কি মনে করেন না যে এই দিক দিয়ে একটা পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হতে পারে যদি সেই সব লোকেরা, যাঁদের কাজ ও অবদান দেখে তাদের কর্ম-সামর্থ্যের ও উদ্দেশ্যের নির্মলতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন থাকে না, তাঁরা যদি খোলাখুলি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে কিছু করতে চেষ্টা করেন? এঁদের উচিত একটা আন্তর্জাতিক সংঘে যোগদান করা। এই সংঘের সদস্য হিসাবে এঁরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন মতামতের আদানপ্রদান করে। এঁরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন সংবাদপত্রাদিতে। অবশ্য সম্মিলিত মতামতের জন্য দায়ী থাকবেন যাঁরা ঐ মতের সপক্ষে সই করবেন তাঁরা সবাই। যে কোন উপযুক্ত সময়েই তাঁরা এরূপ করতে পারেন। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁদের এই প্রকাশিত মতামতের একটা স্বাস্থ্যপ্রদ নৈতিক প্রভাবও তো পড়তে পারে!

'অবশ্য এই রকম সংঘকে অনেকেই ভালো চোখে দেখবে না। এবং এর পথে বাধা ও বিপদ সৃষ্টি হতে পারে অনেক। তবুও বিভিন্ন দেশের মনীষীদের কর্তব্য হিসাবে এই রূপ প্রচেষ্টায় উৎসাহবান উচিত।'

এতবড় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে 'বাণী' দেওয়াই যথেষ্ট। এদের সময় ও সুযোগ কোথায় সোজাসুজি রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করবার! কিন্তু আইনষ্টাইনকে মাঝে মাঝে এই রূপ করতে হয়েছে। তিনি কতগুলি সাম্রাজ্য-বিরোধী সভা, নিরস্ত্রীকরণ সভা ও শান্তি সভায় শুধু যোগদানই করেন নাই, সেই সব জায়গায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে স্পষ্ট ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইহুদীদের প্রশ্ন নিয়ে তিনি খোলাখুলি ভাবেই এর সমাধানে নেমে গিয়েছিলেন। ইহুদী আন্দোলনের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, অকাতরে নিজের অর্থ বিলিয়েছেন। হিট্‌লারের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে খোলাখুলি

প্রতিবাদ জানানোর জন্য তাঁকে অনেক দিন নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয় ; পরে তিনি নিজের থেকেই জার্মানীতে প্রত্যাগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মত ছিল সুস্পষ্ট ; যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব তিনি প্রকাশ করে এসেছেন জীবনের প্রথম থেকেই, বাধ্যতামূলক সামরিক জীবনের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন তিনি। গায়ের রঙের জন্য কোন মানুষ ও জাতি অবজ্ঞাত হবে, তা তিনি পছন্দ করতেন না। এশিয়াবাসীদের প্রতি তাঁর আছে বিপুল সশ্রদ্ধ ধারণা। আমেরিকার নিগ্রোদের অধিকারের দাবী তিনি সমর্থন করেছেন আমেরিকার বুকেই দৃঢ়তার সাথে।

তাঁর রাজনৈতিক দর্শন হলো সাম্রাজ্য-বিরোধী, শোষণ-বিরোধী দর্শন। তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সমাজের শ্রেণী-বিভাগও তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি শ্রেণী-পার্থক্য ন্যায় ও নীতির বিরোধী ; এর শেষ নির্ভর হলো জোর ; শুধু গায়ের জোরেই এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার এই শ্রেণীহীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সমাজ কম্যুনিজমেরই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তবু তিনি মার্কস্‌বাদী নন। কেন না মার্কস্‌বাদের ধারা ও বিশ্লেষণ তিনি সবক্ষেত্রে সমর্থন করেন না, যদিও লক্ষ্যের দিক থেকে এই দুই মনীষীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বোঝা যায় না' ষ্ট্যালিনের সোসিয়ালিজম এক-নায়কত্বমূলক বলে তাঁর সমর্থন লাভ করতে পারেনি, যদিও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রমূলক লক্ষ্যগুলি তাঁর সমর্থন পেয়েছে ; তবু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় বলে সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান না। এর অভিকেন্দ্রিক গতি লক্ষ্য করে, এর যান্ত্রিক পরিবেশ দেখে তিনি খুশী হতে পারেননি। যেই রাজনীতিতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, তার উদ্দেশ্য যত বৃহৎই হোক না, আইনষ্টাইন তা সমর্থন

করতে পারেন না। শান্তিবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সমর্থনকারী সাম্রাজ্য-বিরোধী, গণতান্ত্রিকতার সমর্থক এবং বিশ্ব-মানবতাবাদী—এই কটি কথা দিয়েই আমরা তাঁর জীবনের এই দিকটার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি।

এতবড় বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অভিমত কি, এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগে। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কি মত এবং তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক, তা তাঁরই নিম্নলিখিত কথাগুলি থেকে আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারব ঃ

'মানবজাতি যা কিছু এই পর্যন্ত করেছে বা ভেবেছে, তা মানুষের অনুভূত প্রয়োজন ও বেদনার প্রশমন নিয়ে—যদি আধ্যাত্মিক ধারা ও প্রগতি সম্বন্ধে কেউ কিছু বুঝতে চায়, তাকে এই কথাগুলিই সর্ব প্রথম মনে রাখতে হবে। অনুভূতি ও কামনা মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সৃষ্টির পিছনে প্রেরণা-শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে চিরকাল, বাইরে থেকে এই সৃষ্টি যতই উচ্চ ও প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করে আছে বলে মনে হোক না কেন। এখন কি সে অনুভূতি ও প্রয়োজন যা মানুষকে ধর্মচিন্তা ও ধর্মবিশ্বাসের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেছে? ধর্মচিন্তা ও ধর্মবিশ্বাস বলতে ব্যাপক ভাবে যা বুঝায়, তারই কথা বলছি আমি আগে। একটু চিন্তা করলেই আমরা জানতে পারব যে ধর্মচিন্তা ও ধর্মানুভূতির সৃষ্টির উপর কত রকম বিভিন্ন মনের ভাবেরই না প্রভাব পড়েছে!

'আদিম মানুষের মনে ভয়ের ভাব জাগিয়ে তুলেছে তাদের ধর্ম্মগত ধারণাগুলি—এই ভয়গুলি হল ক্ষুধা, রোগ, বন্য পশু ও মৃত্যুর ভয়।

ঐ স্তরে কার্য-কারণ সম্বন্ধে মানুষের বোধ-বৃত্তি তখন স্বভাবতই সামান্য উন্নত হয়েছিল। এই জন্য তখনকার মন দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতো

নিজের মত কিছুকে, যাদের ইচ্ছা ও কাজের উপর নির্ভর করতো ঐ সব ভয়াত্মক ঘটনাগুলি। এই ক্ষেত্রে মানুষ চাইত একটা কিছু কাজ করে বা একটা কিছু বলিদান করে (বংশ পরম্পরায় এই রূপ ধারণারই অনুগামী হয়েছে তারা) এই সব দেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করতে। তারা প্রার্থনা করতো, যাতে দেবতারা তাদের প্রতি অর্থাৎ এই মরণশীল মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। এই ধর্ম অনেকটা পূর্ণ ভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি বিশেষ পুরোহিত জাতি গঠনের মধ্য দিয়ে। এই পুরোহিতরা জনসাধারণ ও যে দেবতাদের তারা ভয় করে—এই উভয়ের মাঝখানে মধ্যস্থ হয়ে গেড়ে বসেছে এবং ঐ ভিত্তিতে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করেছে। অনেক ক্ষেত্রে একজন নেতা বা অধিপতি যার অধিকার নির্ভর করে অন্যান্য কারণের উপর, অথবা একটা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী—এরা তাদের ঐ রাজকীয় বা ঐ জাতীয় পদের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে পৌরহিত্যের কাজ তাদের অধিকারটাকে আরো নিরাপদ করবার জন্য। অথবা শাসকশ্রেণী ও এই পুরোহিত শ্রেণী একই উদ্দেশ্যে একই স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এরপর ধর্ম দানা বেঁধেছে অন্য আর একটি অনুভূতির উপর—এ হল সামাজিক অনুভূতি। পিতা মাতা অথবা সমাজের নেতা কেউ চিরকাল বেঁচে থাকেন না। তাঁরা যে সব সময় জীবনে কৃতকার্য হবেন তার কোন মানে নাই। মানুষ তাই চেয়েছে জীবনের পথ-নির্দেশ দেয় এমন কিছুকে। তারা চেয়েছে প্রেম, তারা চেয়েছে কারো উপর নির্ভরশীল হতে। এমন মনোভাব নিয়েই মানুষ ভগবানকে কেন্দ্র করে একটা সামাজিক ও নৈতিক ধর্মের সৃষ্টি করে তুলেছে। তাদের এই ধারণায় গড়া ভগবান হল করুণাময়, শুভানুধ্যায়ী। ইনি মানুষকে রক্ষা করেন মানুষের জন্য ব্যবস্থা করেন, তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করেন, এবং অন্যায় করলে তার জন্যও

শাস্তি দেন। এইরূপ ধর্মবিশ্বাসী যারা, তারা তাদের বিশ্বাসের ব্যাপকতা অনুসারে মনে করে যে ভগবান তাদের ভালবাসেন, তাদের প্রতিপালন করেন; এই রূপে কোন জাতিকে বা সমগ্র মানব জাতিকে ভগবান রক্ষা করে আসছেন; এমন কি ব্যক্তি বিশেষের দুঃখে তিনি দেন সান্ত্বনা—তাদের আকাঙ্ক্ষার অচিরতার্থতার মধ্যে তারা খোঁজে সান্ত্বনা ভগবানের কাছ থেকে। এমন কি তারা এও মনে করে যে ভগবান মৃতের আত্মাকে সংরক্ষণ করে থাকেন। এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাস প্রসূত হয় মানুষের সামাজিক ও নৈতিক ধারণা থেকে।

তারপর তিনি বলেছেন:

'সমস্ত যুগের, সমস্ত কালের মানুষ ভগবানকে মানুষেরই প্রতিরূপে কল্পনা করে এসেছে। অসাধারণ জ্ঞানানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ বা ঐরূপ অসাধারণ উচ্চ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষের সমাজ সত্য সত্য ভাবে এই ধারণাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারে, সাধারণ ভাবে বিচার করলে এই রূপই দেখা যায়। কিন্তু এর পরও আছে ধর্মানুভূতির আর একটা দিক বা তৃতীয় দিক: সমস্ত স্তরের মানুষের জীবনেই এ প্রতিভাত হয়, যদিও সম্পূর্ণ বিমিশ্রিত ভাবে এই ধারণা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। মানুষের এই অনুভূতিকে আমি বলব বিশ্ব-ধর্মানুভূতি। যাদের মধ্যে এই অনুভূতি এক বিন্দু জাগেনি, তাদের কাছে এই অনুভূতির ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয় মোটেই, বিশেষ করে ঠিক এর সঙ্গে খাপ খেতে পারে, এই রূপ মানবরূপী ভগবানের ধারণা করবার সুযোগ যখন এতে নেই।

এই রূপ বিশ্বানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি অনুভব করে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের শূন্যগর্ভতা আর অপর দিকে তাদের অনুভূতিতে জেগে ওঠে বিশ্বরূপের মহিমান্বিত দিক ও তার আশ্চর্য পরিচয়। সে তখন অনুভব করে তার এই ব্যক্তি-অস্তিত্ব অনেকটা কারাগৃহে জীবনযাপন

করার মতই। এই অবস্থায় সে চায় বিশ্বকে উপলব্ধি করতে এক একক সত্তা হিসাবে। সভ্যতার প্রাথমিক উন্নতির দিনগুলিতেই মানুষের মনে এই বিশ্বানুভূতি জেগেছে বলে পরিচয় পাওয়া যায়। ডেভিড এবং ধর্ম্ম-প্রবর্তকদের কারো কারো স্তোত্রের মধ্যে আমার এই আভাস পাই। শোপেনহাওয়েরের আশ্চর্য রচনাতে বুদ্ধের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে এই অনুভূতির শক্তিশালী বিকাশের কথা উল্লেখিত আছে।'

এর পরে আইনষ্টাইন বলেছেন, 'ভগবান ও ভগবান-বিষয়ক ব্যাপারে যদি কেহ কোন নির্দিষ্ট ধারণা না জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে এই বিশ্বধর্মানুভূতিকে একজন আর একজনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারবে কি করে—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি মনে করি যে ললিত-কলা ও বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড় কাজ হল মানুষের মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে-তোলা, এবং যারা গ্রহন করতে পারে, তাদের মধ্যে এই ভাব জাগিয়ে রাখা।'

'এই ভাবে আমরা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে একটা ধারণায় এসে পৌছেছি। ঐতিহাসিক ভাবে এই জিনিসটা দেখতে গিয়ে অনেকেই দেখতে পান বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা বিরাট অমিল রয়ে গেছে। তাদের এই ধারণা দূরীভূত করা অনেকটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এই মনোভাবের কারণ সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি বিশ্বের কার্যকারণাত্মক নিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন একটি কিছু ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, যা জগতের ঘটনা-প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারে; যদি তিনি এই কারণ তত্ত্বকে সত্য সত্যই গভীর ভাবে ও আন্তরিক ভাবে মেনে নেন, তবে ভয় প্রসূত ধর্ম তাঁর কোন কাজে লাগে না, সামাজিক নৈতিক ধর্মও সামান্যই তার কাজে লাগে।'

দেশ, কাল ও মাধ্যাকর্ষণ

[১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশিত আইনষ্টাইনের রচনা]

আপনার সংবাদদাতা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন টাইম্‌স্-এর জন্য আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে কিছু লিখতে। আমি আনন্দের সাথেই তাঁর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকদের যোগাযোগের মাঝখানে যে দুঃখজনক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল,তার অবসানের পর আমি ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদদের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের এই সুযোগকে গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করছি। মহাযুদ্ধের মাঝখানে তাঁদের শত্রু-দেশে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে ও প্রকাশিত হয়, তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের যে সময় ও শ্রমের ব্যবহার করেন এবং অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তা তাঁদের উচ্চ ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যেরই পরিচয় দেয়। যদিও আলোক-রশ্মির উপর সৌর-মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রেরও প্রভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ ভাবে গবেষণার একটা বহির্মুখী দিক, তবু আমি পরিপূর্ণ খুশীর সাথে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ইংরাজ সতীর্থদের নিকট, যাঁরা বিজ্ঞানের এই দিকটায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা যদি এই ভাবে আমাকে সাহায্য না করতেন, তা হলে আমার তত্ত্ব-প্রসূত প্রধান অনুমানই ব্যর্থ হয়ে যেত।

পদার্থ বিজ্ঞানে নানারকম তত্ত্ব আছে। এইগুলির অধিকাংশ হল গঠনমূলক। তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে কতগুলি

ছোটখাটো প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটা জটিল বিষয় প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা হয় এই ভাবে। যেমন গ্যাস-সম্পর্কিত গতিতত্ত্ব এই গতিতত্ত্ব অনুযায়ী গ্যাসের অণুগুলি প্রবাহ ও বিস্তারধর্মী এবং এগুলি একটা যান্ত্রিক নিয়মে ও তাপের প্রভাবে পরিচালিত হয়। আমরা যখন বলি যে কতগুলি প্রাকৃতিক বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, তখন তার মানে এই হয় যে আমরা জানতে পেরেছি একটা গঠনমূলক তত্ত্ব বা থিয়োরীকে যা দিয়ে প্রকৃতির ঐ বিষয়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়েছে।

এই সব অতিশয় মূল্যবান তত্ত্বগুলি ছাড়াও আর এক প্রকার তত্ত্ব আছে, যাকে বলা যেতে পারে মূল-নীতিগত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের পথ অনুসরণ করে, সমাবেশ বা সমন্বয়ে পন্থা এর নয়।

এর প্রারম্ভ ও ভিত্তি অনুমানগত উপাদানে গড়া নয়, প্রায়োগিক উপায়ে পরীক্ষামূলক ভাবে বিষয়-বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের উপর এই মূলতত্ত্ব-গুলি প্রতিষ্ঠিত। এই মূলতত্ত্ব থেকে গাণিতিক ফর্মুলা বের করে নিয়ে তার সাহায্য বস্তুকে ব্যাখ্যা করা হয় এই রীতিতে। যেমন তাপগতি বিদ্যা (thermo-dynamics). এর সুরু হল এই তথ্য থেকে যে সাধারণ অভিজ্ঞতায় নিরন্তর গতি বলে কিছু বলে ধরা পড়ে না। এর মধ্য দিয়ে এর পর বিশ্লেষণের পন্থায় এই রকম একটি তত্ত্ব দাড় করানো হয়, যা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। গঠনমূলক তত্ত্বগুলির বিশেষ গুণ হল যে এগুলি ব্যাপক ভাবে মন দিয়ে গ্রহণযোগ্য ও সুস্পষ্ট ; আর সব জায়গাতেই এইগুলি নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। আর মূলনীতিগত তত্ত্বগুলির বিশেষ গুণ হল এদের পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিকতা ও ভিত্তির নিরাপত্তা।

আপেক্ষিক তত্ত্ব হল এই রূপ একটি মূল-নীতিগত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বুঝতে হলে এই মূলনীতিকে বুঝতে হবে, যার উপরে এ প্রতিষ্ঠিত। এই

সম্বন্ধে বলবার আগে এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে আপেক্ষিক তত্ত্বটা হল একটা দোতলা বাড়ীর মত, যে বাড়ীর তলাগুলি পৃথক পৃথক ; এর একটি তলা হল বিশেষ (special) আপেক্ষিক তত্ত্ব, দ্বিতীয়টি হল সাধারণ (general) আপেক্ষিক তত্ত্ব।

গ্রীক্‌দের আমল থেকেই এই কথাটা সুপরিচিত যে কোন বস্তু-পিণ্ডের গতি ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের অন্য একটি বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে এর ব্যাখ্যা করতে হবে। রেলগাড়ীর গতি ব্যাখ্যা করতে হলে মাটির কথা তুলতে হবে ; একটা গ্রহের গতি ব্যাখ্যার জন্য চাই কতগুলি দৃশ্যমান স্থির নক্ষত্রের একত্র সমাবেশের সাথে তুলনা। পদার্থ বিজ্ঞানে কোন বস্তুর গতির স্থানিক ভাবে পরিচয় দেওয়া হয় যে বস্তু সমষ্টির সম্পর্কে, তাকে বলা হয় সম-নির্দেশিত সংস্থিতি বা system of co-ordinates। এই সম-নির্দেশিত সংস্থিতি থাকাতে গ্যালেলিও ও নিউটনের বল বিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে বিধিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছে। যেমন খুশী ভাবে এই সম-নির্দেশিত সংস্থিতির গতির স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, যদি বলবিদ্যায় নিয়মগুলির সত্যতা স্বীকার করতে হয়। (কোন রূপ মোচড় (twisting) এবং ক্রমগতিবেগ (acceleration) থেকে এর বিমুক্ত থাকা চাই) বলবিদ্যায় অন্তর্গত এই সম-নির্দেশিত সংস্থিতিকে বলা হয় ঝোঁকের অবস্থা (system of inertia)—বস্তুর এই inertia বা ঝোঁক প্রাকৃতিক কারণে কোন একই নিয়মে সীমাবদ্ধ নয়, যদি বলবিদ্যার দিক থেকে এ নিয়ে বিচার করা যায়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবটিতে যে নিয়মের বিষয় বলা হচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট হবে।

কোনো সম-নির্দেশিত সংস্থিতি যদি কোনো এক ঝোঁক বিশিষ্ট বস্তু-সংস্থিতির মত একই গতিবেগে একই দিকে ধাবমান হয়, তা হলে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

যে কোন প্রাকৃতিক অবস্থা বা ধারায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির প্রয়োগ হলো বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব :

প্রস্তাবটি এই : যদি ক(১) নামীয় সংস্থিতির পক্ষে একটি প্রাকৃতিক নিয়ম সত্য হয়, তাহা হলে ক(২)-এর পক্ষেও এই নিয়ম সত্য হবে যদি ক (১) এবং ক (২)-এর গতিবেগ ও গতির দিক একই সমান হয়।

আর একটি নীতি যার উপর এই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব নির্ভরশীল, তা হল শূন্যতার মধ্যে আলোর স্বাধীন গতিবেগ (velocity) ও নিরন্তরতা বা constantcy. শূন্যতার মধ্যে আলোর গতিবেগ সুনির্দিষ্ট ও এবং তা নিরন্তর। যেখান হতে এই আলোর উৎপত্তি তার গতিবেগে হতে আলোর গতিবেগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ম্যাক্স্‌ওয়েল-লরেন্‌ৎস্‌-এর বিদ্যুৎ-গতি তত্ত্ব (electro-dynamics) থেকে এই সত্য প্রমাণিত হওয়ায় পদার্থবিদ্‌গণ ইহা গ্রহণ করেছেন।

আমি এখানে যে দুটি নীতির কথা উল্লেখ করলাম, পরীক্ষামূলক ভাবে এর সত্যতা বেশ ভাল ভাবেই গৃহীত হয়েছে; তবে যুক্তির দিক থেকে ঠিক স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের এই যুক্তির দিকটা নিয়ে একটা মীমাংসায় আসা গেছে kinematic (গতিতত্ত্ব), তথা দেশ ও কাল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও নীতি ব্যাখ্যার সাহায্যে। দুটি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সমস্ত দিক দিয়ে মিল আছে, এই রূপ কথা যদি কেউ বলেন, তবে তাকে বলতে হবে যে ঐ দুটি ঘটনারই সম্পর্ক রয়েছে একই বস্তু-সংস্থিতি সঙ্গে। এ না হলে ঐরূপ কথা বলার কোন মানে হয় না। এই বস্তু-সংস্থিতির সম্পর্কে কোন পদার্থের বা ঘড়ির কাঁটার চলমান অবস্থার (state of motion) স্বরূপ কি দাঁড়ায়, তা জানা গেলে

ঐ পদার্থের বস্তু-পরিমাণ (mass) কতখানি এবং ঐ ঘড়ির কাঁটার গতির হার (rate of movement) কি তা জানা যায়, তার আগে নয়।

এই যে আপেক্ষিক গতি তত্ত্ব, যার কথা আমি উল্লেখ করলাম, তার সাথে গ্যালেলিও এবং নিউটনের গতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় নিয়মগুলির রীতিমত সংঘর্ষ বাধে। নিউটনের গতিবিজ্ঞান থেকে কতগুলি সাধারণীয় গাণিতিক হিসাব ও নিয়মের উৎপত্তি হয়েছে, যার সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যাওয়া উচিত, যদি ঐ দুটি মূল নীতির মধ্যে পারস্পরিক মিল থাকে। এই খাপ খাওয়ানোর জন্য পদার্থ-বিজ্ঞানকে কিছুটা বদলাতে হযেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল খুব দ্রুত চলমান বস্তু-বিন্দুর গতি সম্পর্কীয় একটি নূতন নিয়ম। বিদ্যুৎ পরিচালিত বস্তুকণিকার সাহায্যে এই তথ্য পরীক্ষামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষ আপেক্ষিক পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিক, তার সাথে বস্তু-জগতের নিশ্চল বস্তুর দিকটা সবচেয়ে বেশী সম্পর্কিত। এই রূপ বস্তুর ঝোঁক নির্ভর করে এরই শক্তি-পরিমাণের (energy-content) উপর। এর ফলে আমরা এই ধারণা করতে বাধ্য হয়েছি যে ঝোঁক-বিশিষ্ট বস্তু অদৃশ্য শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তু-পরিমাণের সংরক্ষণ তত্ত্ব তার স্বাধীনতা হারিয়ে শক্তি সংরক্ষণ তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব, সহজ ভাবে বলতে গেলে, ম্যাক্সওয়েল ও লরেনৎস্-এর বিদ্যুৎ-গতি তত্ত্বের বিস্তৃতি সাধন মাত্র, কিন্তু এর পরিণতি যা দাঁড়িয়েছে, তা এই তত্ত্বকে অনেকখানিই অতিক্রম করেছে।

কোন সমনির্দেশিত সংস্থিতির .সাথে সম্পর্কযুক্ত পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মগুলির স্বাধীনতা কি সীমাবদ্ধ থাকবে কতকগুলি সমগতি-বিশিষ্ট

সংস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্কের উপর? প্রকৃতি এই সংস্থিতি ও তাদের গতি ইত্যাদিকে কি ভাবেই বা গ্রহণ করবে? যদিও প্রকৃতিকে ব্যাখা করবার জন্য আমাদের এই সব সুবিধামত নির্বাচিত সংস্থিতির কথা তুলতে হবে, তবু এই সংস্থিতির চলমান অবস্থার ব্যাখ্যায় নির্বাচনের ব্যাপারে ইচ্ছামত কিছু করলে চলবে না।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে সংঘর্ষ বাধে একটা সুবিখ্যাত পরীক্ষামূলক তথ্যের সাথে। এই তথ্য অনুসারে জানা গেছে যে একটা বস্তুপিণ্ডের ওজন ও ঝোঁক সম-অবস্থার অর্থাৎ ওজন ও ঝোঁকের এককতার উপরই নির্ভর করে। বিবেচনা করুন নিউটনীয় কোন ঝোঁকের সংস্থিতির সাথে সম্পর্কিত একটি স্থায়ী ঘূর্ণায়মান সমনির্দেশিত সংস্থিতির কথা; এই ক্ষেত্রে এই সংস্থিতির সম্পর্কে যে গতিশক্তি কেন্দ্রাতিগ দেখতে পাওয়া যায়, তার জন্য নিউটনের মতে ঝোঁক বা inertia-ই দায়ী। কিন্তু এই কেন্দ্রাতিগ গতিশক্তি মাধ্যাকর্ষণের মত বস্তুপিণ্ডের বস্তু-পরিমাণের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই অবস্থায় এরূপ ধারণা করা যায় না কি সমনির্দেশিত বস্তু-সংস্থিতির স্থির অবস্থায় আছে আর কেন্দ্রাতিগ গতিশক্তি মাধ্যাকর্ষণমূলক। এই ব্যাখাই স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু এত দিনের প্রচলিত গতিবিজ্ঞান এই রূপ ব্যাখা মেনে নিতে রাজী নয়।

এই সামান্য চিত্র থেকে বুঝতে পারা যায় কেন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের আওতার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি পড়ে। এই ধারণার পথে গবেষণা করার ফলে এর সত্যতাই প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু যেরূপ প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক শক্ত ছিল এই পথ। কেন না, এই নূতন তত্ত্ব ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে করেছে সঙ্কোচিত।

অর্থাৎ যে-নিয়ম অনুসারে বস্তু-পিণ্ডগুলি 'দেশে'র মধ্যে সাজানো আছে, সে নিয়মের সঙ্গে ইউক্লিডের ঘনবস্তু সম্পর্কীয় জ্যামিতির নিয়মের খাপ খায় না। 'দেশের সঙ্কোচন বা জড়িয়ে যাওয়া (warp of the space) কথাটার মানে এই। এই কারণে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সরল রেখা, সমতল ইত্যাদি শব্দগুলির খাঁটী অর্থ আর থাকছে না।

সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের দরুন দেশ ও কাল, গতিবাদ (kinematics) ইত্যাদি সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞানের পরম (absolute) ভিত্তি বলে আর পরিগণিত হচ্ছে না। বস্তুপিণ্ডের সময়ের পরিমাপের জ্যামিতিক দিকটা প্রথমতঃ নির্ভর করে তাদের মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রের উপর, যা আবার সৃষ্ট হয় সংশ্লিষ্ট বস্তুর অবস্থানেব দরুন।

এই রূপে মূলনীতির দিক থেকে এই নূতন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই নূতন তত্ত্বের পথই হল আলাদা। কার্যক্ষেত্রে এই দুইয়ের প্রয়োগ হলে এমন মিল দেখা যায় যে এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিকই রয়েছ, পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তার অতি সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায় মাত্র। এই পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে এবং ধরা পড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে:

১। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি যে সব ডিম্বাকৃতি অক্ষপথে ঘোরে, সে পথের বিচ্যুতি (বুধগ্রহের ব্যাপারে প্রমাণিত)

২। মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্রে আলোক-রশ্মির বিচ্যুতি (ইংরেজদের সূর্য-গ্রহণ অভিযান দ্বারা প্রমাণিত)

৩। যদি বেশ বিরাট বস্তু-বিশিষ্ট নক্ষত্র সমূহ হতে আমাদের দিকে আলো আসতে থাকে, তাহলে দেখা যাবে বর্ণালীর রেখাগুলি বর্ণালীর রক্ত-বর্ণ দিকটার দিকে সরে যাবে (এখনও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি)

এই আপেক্ষিক তত্ত্বের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর যৌক্তিকতার সারবত্তা। এ থেকে যে কোন অনুমান যদি স্বীকারযোগ্য না হয় তা হলে সমস্ত তত্ত্বই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। সমগ্র তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে এর কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হয়।

কেউ যেন মনে না করেন যে সত্যি সত্যি এই তত্ত্ব বা অন্য কোন তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে নিউটনের বিরাট সৃষ্টি তার আসনচ্যুত হবে। তাঁর সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত আদর্শগুলি চিরকাল তাদের বিশেষত্ব বজায় রেখে চলবে ভিত্তিমূল হিসাবে, যার উপর আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে।

এরপর শেষ মন্তব্য দিচ্ছি। আমার ও আমার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে টাইম্‌স্ পত্রিকায় যে লেখা বের হয়েছে, তাতে করে লেখকের কল্পনার হাস্যকর বাহাদুরিই প্রকাশ পায়। পাঠকদের রুচির উপর আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রয়োগ হওয়ার ফলে আমি আজ জার্মানীতে জার্মান বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিত, আর ইংল্যাণ্ডে আমার পরিচয় সুইজারল্যাণ্ডবাসী ইহুদী। এর পর কেউ যদি আমাকে কালো একটি জানোয়ার বলে মনে করতে চায়, তা হলে এই বর্ণনা আপাততঃ চাপা রাখা হবে বলে মনে হয়। এই ক্ষেত্রে আমি জার্মানদের নিকট পরিচিত হবে সুইজ্ ইহুদী হিসাবে এবং ইংরাজদের কাছে পরিচিত হব জার্মান বৈজ্ঞানিক হিসাবে।

সমাপ্ত